ইউনিট ৭

আখলাকে হামীদা (সচ্চরিত্র)

ভূমিকা

আখলাক মানে সদাচর ও সৌজন্যমূলক আচরণ। ইসলামী পরিভাষায় মানুষের মধ্যে একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য যে সব সদাচার ও ভাল ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় 'আখলাক'। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে যার কথা, কাজ ও ব্যবহার সুন্দর, সবাই তাকে ভালবাসে এবং তার প্রশংসা করে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব তথা সকলের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করাই 'আখলাকে হামীদা' বা প্রশংসনীয় আচরণ।

মহানবী (স) বলেন-

خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا

উচ্চারণ ঃ 'খিইয়ারুকুমু আহছানুকুম আখলাকান'।

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।"

যে সকল আচরণে মানুষের সৎগুণাবলি প্রকাশ পায়, আমরা এ ইউনিটে সে সব বিষয়ের কতিপয় দিক আলোচনা করব। যথা- তাকওয়া, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, শোকর, ওয়াদা পালন ইত্যাদি।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল-

পাঠ-১ ঃ আখলাক
পাঠ-২ ঃ তাকওয়া
পাঠ-৩ ঃ সত্যবাদিতা
পাঠ-৪ ঃ আমানত
পাঠ-৫ ঃ আহাদ
পাঠ-৬ ঃ সবর (ধৈর্য)
পাঠ-৭ ঃ আদল
পাঠ-৮ ঃ শালীনতা
পাঠ-৯ ঃ আত্মশুদ্ধি (তাসাউফ)
পাঠ-১০ঃ স্বদেশপ্রেম
পাঠ-১১ঃ হালাল উপার্জন
পাঠ-১২ঃ সৎসঙ্গ

পাঠ ১ আখলাক أَخْلَاقٌ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- আখলাক কাকে বলে, তা বলতে পারবেন।
- আখলাকের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৭.১.১ আখলাক

আখলাক (أَخْلَاقٌ) শব্দটি খুলুকুন (خُلُقٌ) এর বহুবচন। এর অর্থ-স্বভাব-সমষ্টি বা চরিত্র, নৈতিক গুণাবলি ইত্যাদি। মানুষের স্বভাব যখন সর্বদিক দিয়ে সুন্দর, নিখুঁত ও মার্জিত হয়, তখন তাকে আখলাক বা সচ্চরিত্র বলে। ইসলামের পরিভাষায় মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত আচার-আচরণ ও কর্মকান্ড ইসলামী শরীআত অনুসারে সুষ্ঠু, সুন্দর, কল্যাণকর ও যথাযথভাবে পালন করাকে আখলাক বলে। সহজ কথায় সুন্দর চরিত্র ও ভাল স্বভাবকে আখলাক বলে।

আখলাক মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহের মধ্যে আখলাক অন্যতম। কেননা, আখলাক মানুষের সবচেয়ে উন্নত গুণ। একটি উন্নত জাতির বা মানুষের জীবনীশক্তি আখলাক। যে জাতির বা মানুষের আখলাক ভাল নয়, সে জাতি এ দুনিয়ায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। বিশ্বলোকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এই আখলাক বা চরিত্রগুণে। আখলাক সুন্দর, মার্জিত ও উন্নত না হলে ভাল মানুষ হওয়া যায় না। খাঁটি মু'মিন হওয়ার জন্য উত্তম চরিত্র পূর্বশর্ত।

৭.১.২ আখলাকের গুরুত্ব

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আখলাক বা সচ্চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। আখলাক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আখলাক ছাড়া জীবনের সব সম্পদ অর্থহীন। মানুষের এ আখলাকের পূর্ণতা বিধানের জন্য মহানবী (স:) এসেছিলেন। তিনি বলেন,

وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি মহান নৈতিক গুণাবলিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি"। (বুখারী)

মহানবী (স:) বলেন-

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"সচ্চরিত্রতার বিচারে যে লোকটি উত্তম, মু'মিনদের মধ্যে সেই পূর্ণ ঈমানের অধিকারী"। (তিরমিযী)

মহানবী (স:) বলেন- "সত্যিকার মু'মিন তারাই যাদের চরিত্র সুন্দর।" মানুষের পার্থিব জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা যেমন উত্তম আখলাকের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি তার পরকালের সুখ-শান্তি ও মুক্তি এর ওপরই নির্ভর করে।

মানুষের স্বভাব চরিত্র যত সুন্দর হবে, সে ততই ধার্মিক এবং কর্মঠ হবে। ফলে সে আল্লাহর কাছেও প্রিয়ভাজন হিসেবে পরিগণিত হবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন أَحَبُّ عِبَادُاللهِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে সকল বান্দাই প্রিয়তম, যারা আখলাকের দিক থেকে তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

আল্লাহর রাসূল (স:) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'কোন কাজের জন্য অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে'? উত্তরে তিনি বলেন-

تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

"আল্লাহর ভয় আর উত্তম চরিত্র।"

কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা খারাপ আচরণের মোকাবিলায় ভাল আদর্শ প্রদর্শন করে, তাদের শেষ নিবাস হবে চিরস্থায়ী জান্নাত।" (রাদ:২২)

সচ্চরিত্রের কারণে কিয়ামতের দিন মু'মিনের পাল্লা ভারী হবে। নবী করিম (স:) বলেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِىْ الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

"নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মু'মিনের পাল্লায় যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভারী হবে, তা হলো উত্তম চরিত্র।"

মানুষের জাগতিক জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি নিরাপত্তার জন্য আখলাক বা সচ্চরিত্র এক বিরাট সম্পদ। চরিত্রবান জাতি বিশ্বের বুকে উন্নত এবং সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত হয়। চরিত্রবানকে কেউ কটু কথা বলে না, মারতে আসে না। তার নিন্দা করে না, বিপদে আপদে সকলে তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। এভাবে আখলাক মানুষের অর্থ-সামাজিক মর্যাদা এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়।

চরিত্রবান মানুষ সকলের কাছে সমাদৃত হয়। সকলে তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। সবাই তার সম্মান রক্ষা করে চলে। শত্রু তার ক্ষতি করার জন্যে অগ্রসর হলে আশেপাশের মানুষ তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে। মু'মিন-মুসলমান হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হল, চরিত্রবান হওয়া। মু'মিনগণ ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উত্তম আখলাকের অধিকারী হয়। তাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার হয় সর্বস্তরের মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য। মহানবী (স:) বলেন, "আমি এসেছি মানবতার মূর্ত প্রতীক রূপে, উত্তম আখলাকের পরিপূর্ণ বিন্যাসের জন্য।" বাস্তবেও তিনি উত্তম আখলাকের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করে বলেন,

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ধারক।" (সূরা কালমঃ ৪)

মানুষের চরিত্রই পাপ ও পুণ্যের মাপকাঠি। চরিত্রের নিরিখেই মানুষের বিচার হবে। কে উত্তম কে ভাল, কে নিকৃষ্ট তা চরিত্রের দ্বারাই নির্ণীত হয়। মহানবী (স:) বলেন–

"اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ"

"সুন্দর ব্যবহারের জন্য পুণ্য রয়েছে।"

আখলাকের কারণেই মানুষ মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়। সমাজের কাছে এবং আল্লাহর কাছেও এ চরিত্রবান মানুষ প্রিয়তর হয়। মহানবী (স:) বলেন, خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র উত্তম।"

চরিত্রই হল মানবতার উন্নতির পথ। ইসলামের মহান মনীষীগণ আখলাকের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বলেছেন- "নৈতিক চরিত্রই হচ্ছে ধর্ম। চরিত্রের দিক দিয়ে যে তোমার চেয়ে বেশি অগ্রসর, ধর্মের দিক দিয়েও সে তোমার চেয়ে অগ্রসর।" আসলে ধর্মীয় জীবনের প্রধান স্তম্ভ হল আখলাক। আর সমাজ জীবনে আখলাক হচ্ছে ভিত্তি। তাই ইসলামে আখলাকের এত গুরুত্ব।

সারাংশ

আখলাক হল মানব চরিত্রের নৈতিক গুণাবলির নাম। এর অর্থ স্বভাব, চরিত্র। মানুষের মধ্যে পরস্পরের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠার জন্য শরীআত নির্দেশিত যে সব ভাল আচরণ, সুন্দর কাজ ও কল্যাণকর দিক রয়েছে তাকেই আখলাক বলে। আখলাকের কারণেই মানুষ সমাজে প্রশংসিত হয়। নবী (স)-এর বাণী অনুযায়ী চরিত্রবান ব্যক্তিই উত্তম ব্যক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপ্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

১. আখলাক শব্দের অর্থ সচ্চরিত্র/অসচ্চরিত্র।

২. সুন্দর চরিত্র ও ভাল স্বভাবকে আখলাক / আবরার বলে।

৩. আখলাক মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ/নগণ্য সম্পদ।

৪. যে জাতির বা মানুষের আখলাক ভাল নয়, সে জাতি এ দুনিয়ায় বেশি দিন টিকে থাকে। থাকতে পারে না।

৫. খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য উত্তম চরিত্র পূর্বশর্ত/শর্ত নয়।

৬. সচ্চরিত্রের কারণে কিয়ামতের দিন মুমিনের নেকীর পাল্লা ভারী হবে/ হালকা হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আখলাক কাকে বলে, বুঝিয়ে লিখুন।

২. মানব জীবনে আখলাকের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

তাকওয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- তাকওয়া কাকে বলে, বলতে পারবেন
- মুত্তাকী কে, তা বর্ণনা করতে পারবেন
- মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন
- তাকওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.২.১ তাকওয়ার পরিচয়

তাকওয়া (,ËÈ) শব্দের অর্থ ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, আত্মশুদ্ধি, পরহেযগারী, নিজেকে কোন বিপদ ও অকল্যাণ থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা, বা কোন অনিষ্ট হতে নিজেকে দূরে রাখা ইত্যাদি।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মত জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলে। যিনি এ অতীব মহৎ গুণের অধিকারী তিনি মুত্তাকী (বহুবচনে মুত্তাকীন) বলে অভিহিত।

ইসলাম মানবকে যে সব চিন্তা, তৎপরতা, কথা, কাজ প্রভৃতি বিষয়ে নিষেধ করেছে তা পরিহার করা, তথা যাবতীয় মন্দ কাজ, অশ্লীল ও অকল্যাণকর দিক বর্জন করে শুভ ও কল্যাণময় দিকগুলো গ্রহণ করাই "তাকওয়া"-র বাস্তবতা।

ইসলামী আখলাকের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য তাকওয়া। তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি মু'মিন জীবনের ভূষণ। মানব জীবনে তাকওয়া এমন একটি মহৎ গুণ, যা মানবকে যাবতীয় কু-কর্ম হতে রক্ষা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করে।

৭.২.২ তাকওয়ার গুরুত্ব

মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলতে থাক (তাকওয়া অবলম্বন কর), তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভাল-মন্দের মধ্যে, পার্থক্য করার মানদন্ড বা যোগ্যতা ও শক্তি দান করবেন। তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। কেননা, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল"। (সূরা আনফাল ঃ ২৯)

এ তাকওয়া অবলম্বন করার সুফল ও পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার ভয় করে এবং নিজেকে কু-প্রবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত রাখে, তার স্থান হবে জান্নাত" (সূরা নাযিয়াত ঃ ৪০-৪১)।

ইসলামী জীবন দর্শনে তাকওয়াই সকল সদগুণের মূল। তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের ব্যক্তি চরিত্র ও সামাজিক চরিত্র গঠনে তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গ স্বরূপ। যার মধ্যে তাকওয়া আছে সে সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে। আর যে আল্লাহকে হাযির-নাযির জানে, সে কোন পাপ কাজে জড়িত হতে পারে না। অপর দিকে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার দ্বারা সকল অপকর্ম করাই সম্ভব। সুতরাং তাকওয়া সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ ও সৎ জীবন যাপনের জন্য মূল চালিকাশক্তি।

৭.২.৩ তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা

আদর্শ জীবন গঠনের জন্য

মানুষের জীবনে তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। ব্যক্তি চরিত্র গঠনে তাকওয়ার বিকল্প নেই। যে মুমিনের হৃদয়ে তাকওয়া আছে, সে কোন অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়তে পারে না। সে নির্জন থেকে নির্জনতর স্থানেও পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না। তাকওয়াবান ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই অন্যায়, পাপাচার ও দুর্নীতি করে না। কারণ সে জানে সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

তাকওয়া হচ্ছে ইবাদত বন্দেগির মূলবস্তু। ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতার কোন মূল্য নেই, যদি সেখানে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় না থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

"আল্লাহর কাছে তোমাদের কুরবানীর গোশত, রক্ত কিছুই পৌঁছে না, পৌঁছে শুধু তাকওয়া"। (সূরা হজ্জ : ৩৭)

আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য

তাকওয়া ঈমানের পূর্ণতা আনয়ন করে। আল্লাহকে যথাযথ ভয় না করলে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ না করে মৃত্যুবরণ করো না"। (সূরা আল ইমরান: ১০২)

আল্লাহর সান্নিধ্য, নৈকট্য এবং সহায়তালাভের জন্যও তাকওয়া অবলম্বন করা প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, কেননা জেনে রেখ-আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন"। (বাকারা ঃ ১৯৪)

আল্লাহর নিকট তাকওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের মাপকাঠি। আল্লাহ বলেন-

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাবান যার মধ্যে বেশি তাকওয়া আছে"। (হুজুরত : ১৩)

তাকওয়ার গুণই মানুষের ইহ-পরকালীন জীবনে সামগ্রিক সাফল্য বয়ে আনবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا

"নিশ্চয়ই তাকওয়াবানদের জন্য রয়েছে সফলতা"। (নাবা: ৩১)

মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধি ও পরিশোধনে জন্য তাকওয়া একান্ত অপরিহার্য। হৃদয়ে তাকওয়া থাকলে সে মানুষ কোন অন্যায়- অশ্লীল কাজ করতে পারে না।

তাকওয়া ব্যক্তি-মানুষের চরিত্রে তার আকিদা বিশ্বাসে, কাজ-কর্মে, আচার-আচরণে, ইবাদত বন্দেগিতে এবং দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠার সৃষ্টি করে। তাই সে হয় সকল কাজে অতীব আন্তরিক এবং নিষ্ঠাবান। তাকওয়া মানুষের ঈমানের মজবুতি ও পূর্ণতা এনে দেয়। যে ব্যক্তি যত বেশি তাকওয়াসম্পন্ন তার ঈমানও তত মজবুত। সে জীবনে-মরণে কখনও তাকওয়া থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয় না। সে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং তাকওয়ার সাথে জীবন যাপন করে।

জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভে তাকওয়া

তাকওয়া মানুষকে জাহান্নামের ভয়াবহ কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দান করে। মহানবী (স:) বলেন, "জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল হল আল্লাহর ভয়। তিনি আরো বলেন- "সেই দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না- যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরায়; আর যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারায় থেকে কাঁদে"। (তিরমিযী)

তাকওয়াবান মানুষ নিশ্চিতভাবে জান্নাতলাভ করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

"আর যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে জান্নাতই তার বাসস্থান"। (সূরা নাযিয়াত ঃ ৪০-৪১)

তাকওয়ার গুণ অর্জিত হলে মানব জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ "অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন"। (সূরা তাক্ওয়াঃ ৪)

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাকওয়া

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাকওয়া একটি বড় গুণ। যদি সমাজের লোকদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ থাকে, তবে সমাজের প্রতিটি সদস্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষের জন্য কাজ করে থাকে। আর দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মূল উৎস হল তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি। তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও সমৃদ্ধির জন্য তাকওয়াবান হওয়া অপরিহার্য। সুনাগরিকত্বের ক্ষেত্রেও তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। একজন সুনাগরিকের প্রধান গুণ ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। আর তাকওয়া থেকেই নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়।

সামাজিক সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি সৃষ্টিতে তাকওয়ার বিকল্প নেই। তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি মানুষের মনে অপর মানুষের প্রতি ভালবাসা, মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও স্নেহ সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা হিসেবে সকলে মিলেমিশে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

মানব জীবনের সবচেয়ে বড় গুণ হল তাকওয়া। যে সমাজের মানুষের মধ্যে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয় সে সমাজ হয় সুখী সমৃদ্ধশালী। তাকওয়াবান মানুষ কখনও ব্যক্তি ও সমাজকে ফাঁকি দেয় না। তাই তাকওয়ার গুণে মানুষ ব্যক্তি জীবনে যেমন হয় সৎ, তেমনি সমাজ জীবনে হয় কর্তব্যনিষ্ঠ। আর এ জন্যই সুষ্ঠু, সুন্দর, ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাকওয়া অর্জন বা তাকওয়া অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য।

সারাংশ

তাকওয়া অর্থ আল্লাহভীতি, পরহেযগারী ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা, নিজেকে পাপ মুক্ত রাখা। আল্লাহর ভয়ে সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মত জীবন যাপন করাকে তাকওয়া বলে। তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয় সম্মান, সমৃদ্ধি এবং ইহ-পরকালীন উন্নতি। আর আল্লাহ তাকওয়াবান লোকদের ভালবাসেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন।

১. তাকওয়া মানে কী?
২. ইসলামী শরীআতে তাকওয়া বলতে কি বুঝায়?
৩. মুত্তাকী কাকে বলে?
৪. মানব জীবনের সবচেয়ে বড় গুণ কী?
৫. 'আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন'- কার বাণী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাকওয়া বলতে কী বুঝায়?
২. তাকওয়া গুরুত্ব লিখুন।
৩. তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

পাঠ ৩ সত্যবাদিতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- 'সিদক'-এর অর্থ বলতে পারবেন
- 'সিদক' এর উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবেন
- 'সিদক' সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা আলোচনা করতে পারবেন।

৭.৩.১ সিদ্‌ক

صِدْقٌ (সিদকুন) শব্দের অর্থ সততা, সত্যবাদিতা বা সত্য-প্রিয়তা। যে ব্যক্তির মধ্যে এ মহৎ গুণ রয়েছে তাকে বলা হয় সত্যবাদী (صَادِقٌ) । চরম সত্যবাদীকে সিদ্দিক (صَدِيْقٌ) বলা হয়। সত্যবাদী মানুষ ইহকালে যেমন সর্বত্র সমাদৃত হন, তেমনি পরকালীন জীবনেও লাভ করবেন জান্নাতের পরম সুখ। আর সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তা ও সত্যাশ্রয়ী সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। একমাত্র ইসলামকেই সত্য দীন ও ইসলাম ব্যতীত অন্য সবকিছুকেই মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ

"ইসলাম সত্য এবং কুফর মিথ্যা"।

সত্যবাদিতা মানব জীবনের একটি অতি মহৎ গুণ। সত্যের মাধ্যমে মানুষ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। ইসলাম সত্যবাদিতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। তাই সব সময় সত্য কথা বলার চেষ্টা করতে হবে।

৭.৩.২ সত্যবাদিতার উপকারিতা

সিদক বা সত্যবাদিতা হচ্ছে মুক্তির পথ। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে তার জীবনের পরতে পরতে সত্যাশ্রয়ী হতে বলেছে। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম, তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যকে আঁকড়ে থাকার জন্য তাকিদ করেছে। সত্যবাদিতার প্রতিদান জান্নাত। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে মহান আল্লাহ অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সকলেই জীবনের মূল্য দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ

"এই তো সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দিবে। তাদের জন্য রয়েছে পরম সুখের জান্নাত .....।"

সত্যবাদিতা কল্যাণময় জীবনের উন্মেষ ঘটায়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স:) ঘোষণা করেন–

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ

"তোমাদের কর্তব্য সত্যাশ্রয়ী হওয়া। কেননা, সত্যবাদিতা পুণ্যময় পথের সন্ধান দেয়, আর পুণ্য জান্নাতের পথে চালিত করে"। সত্যবাদীকে সবাই ভালবাসে এবং তার বিপদে আপদে সকলে এগিয়ে আসে। সর্বত্র তিনি সম্মানিত ও আদরণীয়। সত্যবাদিতার গুণে মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি পায়। মহানবী (স:) বলেন-

اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

"সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় আর মিথ্যাচার ধ্বংস করে"।

মহানবী (স:) ছিলেন সত্যবাদিতার জীবন্ত আদর্শ। তাঁর সত্যনিষ্ঠার জন্য চরম শত্রুরাও তাঁকে 'আল-আমীন' (‹‹%o‹‹ÂÍÊ) উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য সত্যবাদিতার গুরুত্ব অপরিসীম। সত্য বলা, সত্য পথে চলা, সত্যের ওপর টিকে থাকা এবং সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা মানব জীবনের মহৎগুণ। আমাদের প্রিয় নবী (স:) শৈশব থেকেই সত্য ভালবাসতেন। সত্য কথা বলতেন। আর তাই জানের দুশমনেরাও তাঁর প্রতি মিথ্যাচারের অভিযোগ করতে পারেনি। সত্যবাদিতা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। মহানবী (স:)-এর এক হাদীস থেকে জানা যায়, ঈমানদার ব্যক্তি অন্যান্য পাপ কাজ করলেও তার পক্ষে মিথ্যা বলা এবং প্রতারণা করা সম্ভব নয়। ঈমানদারের পক্ষে মিথ্যা বলা শোভা পায় না। আল্লাহ বলেন-

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكِذْبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

"মিথ্যা তারাই বলে যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান রাখে না"।

রাসূল (স:) কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন– "মু'মিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? মহানবী (স:) বলেন- না, মু'মিন কখনও মিথ্যাবাদী হতে পারে না। "মিথ্যা ও ঈমান কখনও একত্র হতে পারে না।" সিদ্‌ক বা সততার গুরুত্ব এত বেশি যে, সদা সর্বদা সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গ অবলম্বন করে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হও"। (সূরা তাওবা : ১১৯)

সত্যবাদিতার গুরুত্ব এত বেশি যে, মহানবী (স:) মৃত্যু আসলেও সত্য বলা ছাড়তে নিষেধ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, "তোমরা সততা অবলম্বন কর, যদি এতে তোমার ধ্বংস কিংবা মৃত্যুও আসে। কেননা, সততার মধ্যে নিহিত আছে অমরত্ব ও পরকালের নাজাত।"

সত্যবাদী লোককে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। এক হাদীসে আছে- "আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসতে চাইলে বা আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা পেতে চাইলে সত্যবাদী হতে হবে" (বাইহাকী)। আল্লাহর দরবারে ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে সত্যবাদিতা। তাই কারো মধ্যে যদি সত্যবাদিতা না থাকে, তবে সে সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত যত কিছুই করুক না কেন, তা তার কোন কাজে আসবে না। মহানবী (স:) বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকতে পারে না, তার পানাহার ত্যাগ করায় (সাওমে) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী)।" সত্যবাদিতা হল জান্নাত লাভের মাধ্যম। এক হাদীসে আছে, "মহানবী (স:) কে জিজ্ঞাসা করা হল- জান্নাতবাসীদের চিহ্ন কি? মহানবী (স:) বললেন, জান্নাতবাসীর আলামত হল সত্য কথা বলা।"

অতএব আমাদের উচিত সত্যকথা বলা এবং সত্যবাদীগণের সাথে চলা। তবেই ইহকালে পাব শান্তি এবং পরকালে পাব মুক্তি।

সার-সংক্ষেপ

সিদ্‌ক অর্থ সততা, সত্যবাদিতা। যার মধ্যে এ সত্যবাদিতার মহান গুণটি রয়েছে তাকে সাদিক বা সত্যবাদী বলা হয়। সত্যবাদীগণ সবার প্রিয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. সিদক অর্থ সত্যবাদিতা/মিথ্যাচার/বিশ্বস্ততা।

২. চরম সত্যবাদীকে বলে সিদ্দিক/কাযিব/আল-আমীন।

৩. সত্যবাদিতা ঈমানের/ইসলামের/মুনাফিকীর বহিঃপ্রকাশ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সত্যবাদিতা (সিদক) কাকে বলে?

২. সত্যবাদিতার উপকারিতা লিখুন।

পাঠ ৪ আমানত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- আমানত কী বলতে পারবেন।
- আমানতের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমানতের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

৭.৪.১ আমানতের পরিচয়

আমানত (أَمَانَةٌ) শব্দটির অর্থ হচ্ছে গচ্ছিত রাখা। এটা খেয়ানতের বিপরীত শব্দ। সাধারণত কারো কাছে কোন অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যিনি গচ্ছিত সম্পদকে যথাযথভাবে হিফাযতে রাখেন এবং তার প্রকৃত মালিক চাওয়া মাত্র তা ফেরত দেন। তাকে 'আমীন' বা বিশ্বস্ত তথা আমানতদার বলা হয়।

অপরদিকে যে সম্পদ গচ্ছিত রাখা হয় তা যথাযথভাবে মালিকের কাছে ফেরত না দিয়ে করে আত্মসাৎ বা লোকসান করাকে বলে খিয়ানত। আর যে ব্যক্তি খিয়ানত করে তাকে খায়িন (خَائِنٌ) বা আত্মসাৎকারী বলা হয়।

আমানতদারিতা ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজ হয় স্থিতিশীল ও সুশৃঙ্খল। সমাজ জীবনে মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সমাজে মানুষের মধ্যে আস্থা-বিশ্বস্ততা না থাকলে সমাজ-সংস্থা সুখের হয় না। সুতরাং সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে যেন- সততা, আমানতদারী, আস্থা ও বিশ্বস্ততা থাকে এবং তা বিস্তার লাভ করে সমাজ সংস্থাকে সুখময় ও নিরাপত্তামূলক স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করে- সেজন্য ইসলাম আমানতদারিতার ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

মহানবী (স:) ছিলেন আমানতদারিতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। তদানীন্তন অন্ধকার নীতিহীন বিশ্বে তিনি পেয়েছিলেন আমানতদারীর মহান "আল-আমীন" খেতাব।

৭.৪.২ আমানত রক্ষা করার গুরুত্ব

আমানত-এর গুরুত্ব এত অধিক যে, ইসলাম আমানত রক্ষা করাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। কারো কাছে যদি কোন ব্যক্তি কিছু মালপত্র বা ধন-সম্পদ কিংবা অন্য কোন বিষয়-আশয় ও দায়িত্ব আমানত রাখে, তবে তা অবশ্যই যত্ন সহকারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। আর যখন মালিক তা ফেরত চায় তখন সাথে সাথে তা ফেরত দিতে হয়। এটাই ইসলামী নীতি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর আদেশ হচ্ছে-

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার মালিকের কাছে ফেরত দান কর।"

আমানত হচ্ছে ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। মহানবী (স:) বলেন-

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ وَهِيَ الْأَمَانَةُ

"যখন কোন লোক কথা বলে সে কথাও এক প্রকার আমানত স্বরূপ"।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আমানতদারীর উপর ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা নির্ভর করে। যাদের ঈমান আছে তারা আমানতের খিয়ানত করতে পারে না। আর যারা খিয়ানত করে, তারা প্রকৃত মু'মিন নয়। তারা প্রতারক, ভন্ড ও মুনাফিক।

সকল ক্ষেত্রে আমানতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য

আমানতের তাৎপর্য ব্যাপক। পৃথিবীতে প্রতিটি নর-নারীর ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত কিছু না কিছু বা অল্প বিস্তর দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্বগুলো আমানতের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাংকের ম্যানেজার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীর কাছে লোকেরা সোনা-রূপা ইত্যাদি মূল্যবান বস্তুসমূহ গচ্ছিত রাখে। এ সবই জনগণের আমানত। দোকানের ম্যানেজারের নিকট দোকানটি তার মালিকের আমানত স্বরূপ। সুতরাং এ সমস্ত আমানতের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণই আমানতদারের কর্তব্য।

শুধুমাত্র অর্থ সম্পদই আমানত নয়। বরং কথাও এক প্রকার আমানত। কেউ যদি কারো কাছে কোন গোপন কথা বলে, তবে সে কথাটিও তার কাছে আমানত স্বরূপ। বিনা অনুমতিতে তা প্রকাশ করা হলে আমানতের খেয়ানত করা হয়।

আমানতের খিয়ানত ঘৃণিত মহাপাপ। এটা মুনাফিকের লক্ষণ। হাদীসে আছে- "মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি তার মধ্যে আমানতের খিয়ানত একটি।" তাই খিয়ানত একটি মারাত্মক পাপ। আমানতের খিয়ানতকারীর জীবন অভিশপ্ত। কেননা, আমানতের খিয়ানতকারী শুধু মানব সমাজেই ঘৃণিত নয়, সে আল্লাহর কাছেও ঘৃণিত-অভিশপ্ত। কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না"। (আনফাল : ৫৮)

আমানতের খেয়ানত সমাজে ও ব্যক্তি জীবনে দুঃখ এবং দারিদ্র্য আনে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয় নেমে আসে। আল্লাহর নবী (স:) বলেন-

اَلْخِيَانَةُ تَجُرُّ الْفَقْرَ

"খিয়ানত দারিদ্র্য ডেকে আনে।"

সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যদি আমানতের গুণটি বিকাশ লাভ করে, তবে সমাজ জীবনের পরিবেশ হয় সুন্দর। সমাজে আস্থা ও বিশ্বস্ততা ফিরে আসে। কাজে কর্মে নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুতা বিরাজ করে। তখন সমাজ সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে কানায় কানায় ভরে উঠে। সমাজের মানুষ আমানতদার হলে সমাজকে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করা যায়।

সারাংশ

আমানতের শাব্দিক অর্থ গচ্ছিত রাখা। সাধারণত কারো কাছে কোন অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। আর যিনি এ আমানত বা গচ্ছিত সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন এবং মালিক চাওয়া মাত্র ফেরত দেন তাকে আমীন বা বিশ্বস্ত বলে। এটি একটি মহৎগুণ, যা সমাজ জীবন থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে সুখ-শান্তির ধারা বয়ে আনতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৭.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপ্রশ্ন

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আমানতের অর্থ কি?

ক. গচ্ছিত রাখা　　খ) গ্রাস করা
গ. গচ্ছা খাওয়া　　ঘ) খেয়ানত করা

২। আমানতের হিফাযতকারীকে কি বলে?

ক. আল-আমীন　　খ) সাদিক
গ. আমীন　　ঘ) হাফিয

৩। গচ্ছিত সম্পদ ফেরত না দেওয়াকে কি বলে?

ক. খায়িন　　খ) মিথ্যাবাদী
গ. খিয়ানত　　ঘ) আমানত

৪। যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার কি নেই?

(ক) ছবর নেই　　খ) ঈমান নেই
গ) আদল নেই　　ঘ) আদর নেই।

৫। মুনাফিকের লক্ষণ কয়টি ?

(ক) ৫টি　　খ)৭টি
গ) ২টি　　ঘ)৩টি

খ) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১) সাধারণত কারো কাছে কোন অর্থ সম্পদ ..... রাখাকে আমানত বলা হয়
২) যে ব্যক্তি খিয়ানত করে, তাকে ..... বলে।
৩) আমানতদারী ঈমানের অপরিহার্য .....।
৪) যাদের ..... আছে তারা আমানতের খিয়ানত করতে পারে না।
৫) আমানতের খিয়ানত ..... লক্ষণ।

গ) সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১) ইসলাম আমানতদারীর প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।
২) মহানবী (স:) ছিলেন আমানতের মূর্ত প্রতীক।
৩) মহানবী (স:) এর খেতাব ছিল আমানতদার।
৪) গচ্ছিত সম্পদ মালিকের কাছে ফেরত দেওয়াকে খিয়ানত বলে।
৫) আমানতের খিয়ানত সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য বয়ে আনে।
৬) সমাজের মানুষ আমানতদার হলে সমাজকে স্বর্গে পরিণত করা যায়।

ঘ) এক কথায় উত্তর দিন।

১) আমানত অর্থ কি?
২) কার আমানতদারীর খ্যাতি-লোকদের মুখে মুখে?
৩) কোন গুণের চর্চা থাকলে সমাজ সুখের হয়?
৪) আল্লাহ কাদেরকে পছন্দ করেন না?
৫) সমাজের সর্বস্তরে আমানতের গুণ বিকাশ লাভ করলে কী সুবিধা হয়?

ঙ) সংক্ষিপ্ত উত্তরপ্রশ্ন।

১) আমানত কাকে বলে?
২) "আমানতের খিয়ানতকারীর জীবন অভিশপ্ত" একথার একটি ব্যাখ্যা দিন।
৩) আমানতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ৫ 'আহাদ (اَلْعَهْدُ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- 'আহাদ কী তা বলতে পারবেন।
- 'আহাদ এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়াদা পালন না করার পরিণতির বিবরণ দিতে পারবেন।

৭.৫.১ 'আহাদ-এর পরিচয়

'আহাদ (اَلْعَهْدُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার করা, ওয়াদা, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় কোন লোকের সাথে কোন অঙ্গীকার করলে বা কোন চুক্তি সম্পাদন করলে তা পরিপূর্ণভাবে পালন করাকে 'আহাদ বা ওয়াদা পালন বলে। মানব সমাজে যাতে সুখ-শান্তি ও পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস বিরাজমান থাকে সে জন্য মানুষকে তার প্রতিটি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মানুষ যদি তাদের ব্যবহারিক জীবনের পারস্পরিক দেওয়া ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ না করে তাহলে সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা লেগেই থাকবে। এ জন্য ইসলাম মানুষকে তার ওয়াদাকৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি মোতাবেক কাজ করার জন্য জোর তাকিদ করেছে। আর ওয়াদা পালন করা আখলাকে হামীদাহ বা প্রশংসনীয় আচরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৭.৫.২ ওয়াদা পালনের গুরুত্ব

ওয়াদা পালন ঈমানের অঙ্গ। ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এমনকি আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে 'আহাদ বা অঙ্গীকার রক্ষা করার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। চুক্তি করে তা রক্ষা না করলে অনেক অঘটন ঘটতে পারে। তখন সমাজে বাস করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। আর তাই চুক্তি মোতাবেক কাজ করা ঈমানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ওয়াদা পালন করার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ কথাবার্তা, বেচাকেনা ও লেন-দেন ইত্যাদি সব বিষয়ে, একে অন্যের সাথে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি বা অঙ্গীকার করে থাকে। এ অঙ্গীকার বা চুক্তি পূর্ণ করাও ঈমানের একটি অঙ্গ। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর"। (মায়িদা ঃ ১)

ওয়াদা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওয়াদা এক প্রকারের ঋণ। কারো কাছ থেকে কোন কিছু ঋণ নিলে তা যেমন পরিশোধ করতে হয়, তেমনি কারো সাথে কোন ওয়াদা করলেও তা পূরণ করতে হয়। মহানবী (স:) বলেন-

عِدَةُ الْمُؤْمِنِ دَيْنٌ

"মুমিনের ওয়াদা ঋণস্বরূপ"।

মহানবী (স:) এবং কুরাইশদের মধ্যে এ সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু কুরায়শগণ যখন এ সন্ধি ভঙ্গ করল, তখন মহানবী (স:) অগত্যা এ সন্ধি বাতিল বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু এর আগে কোন দিন তিনি এ সন্ধির একটি নীতিও ভঙ্গ করেননি।

যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। পৃথিবীতে সে সকলের কাছে প্রিয়তর ও সম্মানিত হয়, আর পরকালে সে পরম সুখ ও শান্তি লাভ করবে। মহানবী (স:) সাহাবীদের বললেন যে, তোমরা যদি ছয়টি বস্তুর জিম্মাদার হও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। উক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যে "'আহাদ" বা ওয়াদা পালন একটি। ওয়াদার ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ বলেন-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"তোমরা ওয়াদা বা চুক্তি পূর্ণ কর। কেননা ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদীহী করতে হবে।" (ইসরা: ৩৪)।

সামাজিক স্থীতিশীলতার ক্ষেত্রে ওয়াদার গুরুত্ব

ওয়াদা বা চুক্তি করে তা রক্ষা করলে সমাজে গতিশীলতা আসে। সমাজ থেকে হতাশা ও দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীভূত হয়। মানুষের মধ্যে আস্থা ও নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজ জীবন উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। ওয়াদা রক্ষা না করলে সমাজ চলতে পারে না। সমাজের গতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। অগ্রগতি ও উন্নতি ব্যাহত হয়। সুতরাং সামাজিক সুখ সমৃদ্ধির জন্য ওয়াদা পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য। ওয়াদা পালন করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হল- উচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসলিম, এমনকি শত্রু-মিত্র সবার সাথেই সমানভাবে ওয়াদা রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ যার সাথেই ওয়াদা করা হোক না কেন তা অবশ্যই পালন করতে হবে। মহানবী (স:) এর সাহাবীগণ যে কোন মূল্যে ওয়াদা পালন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মহানবী (স:) একবার এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তা রক্ষার জন্য তিনি তিন দিন পর্যন্ত একই জায়গায় লোকটির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

৭.৫.৩ ওয়াদা পালন না করার পরিণতি

ওয়াদা বা অঙ্গীকার করে তা পালন না করা জঘন্যতম অপরাধ। মহানবী (স:) বলেন-

"যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার ধর্ম নেই"।

কাজেই বুঝা যায় ওয়াদা রক্ষা না করা ঈমানের পরিপন্থী। যারা ওয়াদা পালন করে না বা কথা দিয়ে কথা রাখে না তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা পালন কর না, এমন কথা বল কেন? এটা আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণিত।" (সূরা সাফ্ফ-২)

ওয়াদা বা অঙ্গীকার এবং চুক্তি তথা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা না করলে সমাজে নানাবিধ সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই প্রতিটি ওয়াদার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে এবং যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

'আহাদ বা ওয়াদা পালন করা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য যেমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমাজ জীবনের জন্য তেমনি অতীব গুরুত্বের দাবিদার। সমাজ জীবনে এর অভাবে যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ওয়াদা পালনের মাধ্যমে সমাজে গতির সৃষ্টি হয়, উন্নত ও সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। আবার ওয়াদা পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা যায়। ফলে পারলৌকিক জীবনও হবে সুখ ও শান্তির।

সারাংশ

'আহাদ অর্থ অঙ্গীকার, ওয়াদা, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি। কোন লোকের সাথে কোন কাজ করার কথা বলে তা পালন করার নাম 'আহাদ। এর মাধ্যমে সমাজ হয় কন্টকমুক্ত। ব্যক্তি জীবনে এটি একটি মহৎ গুণ, তাই ইসলাম ওয়াদা পালনের ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ওয়াদা পূর্ণ করা ..... বা প্রশংসনীয় আচরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

খ) চুক্তি রক্ষা না করলে সমাজে বহু ..... ঘটে।

গ) চুক্তি মোতাবেক কাজ করা ঈমানের একটি ..... অঙ্গ।

ঘ) ওয়াদা এক প্রকার .....।
ঙ) ওয়াদা বা চুক্তি করে তা রক্ষা করলে সমাজে ..... আসে।
চ) অঙ্গীকার করে তা পালন না করা জঘন্যতম .....।

২। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক) চুক্তি রক্ষা না করলে সমাজ জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।
খ) হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানরা ভঙ্গ করেছিল।
গ) আল্লাহ যা কিছু করতে আদেশ করেছেন এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তার সবই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।
ঘ) ওয়াদার ব্যাপারে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে না।
ঙ) যারা ওয়াদা ভঙ্গ করে সবাই তাদের ভালবাসে।

৩। ডান পার্শ্বের সাথে বাম পার্শ্বের মিল করে বাক্য পূর্ণ করুন।

(ক) অঙ্গীকার করে তা পালন না করা	(ক) আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ।
(খ) যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না	(খ) জবাবদিহি করতে হবে
(গ) ওয়াদা সম্পর্কে	(গ) জঘন্যতম অপরাধ
(ঘ) ওয়াদা পালন করলে	(ঘ) তার ধর্ম নেই
(ঙ) প্রতিটি মুসলমান	(ঙ) সমাজ সুখের হয়।

৪। এক কথা উত্তর দিন।

ক) মহানবীর (স:) সাথে কুরাইশদের যে সন্ধি হয়েছিল তার নাম কি?
খ) কারা প্রথম হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছিল?
গ) কোন ব্যক্তির ধর্ম নেই বলে নবী (স) ঘোষণা করেছেন?
ঘ) আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণিত কোন্ কাজ?
ঙ) চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে সমাজের কি সমস্যা হয়?
চ) মহানবী (স:) এক জায়গায় তিন দিন অপেক্ষা করছিলেন কেন?

৫। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১) যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না তার কি নেই?
ক) কর্ম নেই খ) ধর্ম নেই গ) আশা নেই ঘ) শান্তি নেই

২) মহানবী (স:) কয়টি বস্তুর জিম্মাদার হওয়ার কথা বলেছেন?
ক) ৩টি খ) ৫টি গ) ৯টি ঘ) ৭টি

৩) 'আহাদ শব্দের অর্থ কি?
ক) শান্তি খ) জান্নাত গ) অঙ্গীকার ঘ) বিশ্বাস

৪) ওয়াদা পালনকারীর উপর আল্লাহ কি হন?
ক) রাগ হন খ) খুশি হন গ) নারাজ হন ঘ) কিছুই হন না

৫) ওয়াদা এক প্রকার কি?
ক) মিথ্যা খ) শান্তি গ) দোষ ঘ) ঋণ

পাঠ ৬ সবর (ধৈর্য)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- 'সবর' এর অর্থ ও সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সবরের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সবরের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বিপদ-আপদ, রোগ-শোক ও মুসিবতে কী করতে হবে, তার বিবরণ দিতে পারবেন।

৭.৬.১ সবর-এ পরিচয়

সবর (اَلصَّبْرُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল ধৈর্য ধারণ করা, সহ্য করা, বিরত থাকা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় যাবতীয় বিপদ-আপদে বা পার্থিব কোন বালা-মুসীবতে কিংবা কোন অন্যায়-অত্যাচারে, দুঃখ-কষ্টে, রোগ-শোকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদিতে কোন রূপ বিচলিত না হয়ে মহান স্রষ্টার উপর নির্ভর করে সবকিছু সহ্য করাকেই ধৈর্য (‹‹%o'››——) বলে। এমনিভাবে সুখ ও আনন্দমুখর অবস্থায় কোন রূপ আত্মহারা না হয়ে নির্বিকার চিত্তে সকল কিছুর ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) নির্দেশিত পথে অটল-অবিচল হয়ে থাকাকেও ইসলামী পরিভাষায় সবর বা ধৈর্য বলা হয়।

মহানবী (স:) বলেন-

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

"সবর বা ধৈর্য ঈমানের অর্ধাংশ।"

সবর বা ধৈর্য মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ। ব্যক্তিগত, সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ-শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নতি-সমৃদ্ধির জন্য সবর বা ধৈর্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, রোগ-শোক, সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় সবর তথা ধৈর্য ধারণ করা প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক গুণ।

৭.৬.২ সবর-এর প্রকারভেদ।

বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গায্যালী (র) সবরকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা-

১. সুখ ও আনন্দে সবর

সুখের সময় মানুষ আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে; আর মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়ে পাপের পথে পা বাড়ায়। তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আত্মহারা না হয়ে সবরের মাধ্যমে কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। এ জন্যই ইসলামের প্রথম যুগের মনীষীগণ আফসোস করে বলেন, "আমরা দুঃখ-দারিদ্র্যের অগ্নি পরীক্ষায় সবর করতে পারলেও, সুখ-সম্পদের পু শয্যায় সবর করতে পারিনি।"

২. বিপদ-মুসীবতে সবর

মানুষ কখন ও কখনও রোগ-শোক, জন্ম-মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়-ভীতি প্রভৃতি নানা রকম বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে থাকে। আর এ সবই তার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। এ প্রতিকূল অবস্থায় বিচলিত না হয়ে, হা হুতাশ না করে, বুকে করাঘাত ও মুখে হায় হায় রব না তুলে আল্লাহর মর্জির উপর সন্তুষ্ট থেকে সবর ইখতিয়ার করতে হবে। বিপদ সহ্য করার ক্ষমতাদান ও বিপদ দূর করার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা

কর। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন"। (সূরা বাকারা) আর এ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ধৈর্যধারণ পূর্বক অবস্থা মুকাবিলা করতে হবে এবং বলতে হবে।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن

(ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য আর তাঁর কাছেই ফিরে যাব।" (সূরা বাকারা)

৩. ইবাদতে সবর

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত বন্দেগির জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ প্রত্যেক প্রকার ইবাদতেই কিছু না কিছু কষ্ট সহ্য করতে হয়। সুতরাং সকল প্রকার ইবাদত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সবরের একান্ত প্রয়োজন।

৪. অত্যাচারে সবর

সমাজ জীবনে সহনশীলতার অভাব হলে মানুষ একে অপরের উপর জুলুম-অত্যাচার শুরু করে দেয়। কিন্তু এ জুলুমের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকার পরও সামাজিক শান্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হল সবর। ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের সবর প্রশংসনীয়। তবে অত্যাচারী যেন এতে উৎসাহী হয়ে আরো অত্যাচারে মেতে উঠতে না পারে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

৫. পাপ কাজে সবর

মানুষের প্রবৃত্তি সদা-সর্বদা অন্যায়-অসত্য ও পাপের প্রতি প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ হয়। এ জন্যই পাপের কাজে বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় লোভ-লালসা চরিতার্থ না করে খুব ধৈর্যের সাথে কু-প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়, অন্যথায় জীবন হয় পাপ-পঙ্কিলতাপূর্ণ। সবর ব্যতীত অন্য কিছুই তাকে পাপ থেকে রক্ষা করে অনন্ত শান্তি নিকেতন বেহেশতে পৌঁছাতে পারে না। মহানবী (স:) বলেন-"সবর বেহেশতের ভান্ডারসমূহের অন্যতম"।

৭.৬.৩ সবরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সবর হচ্ছে মানব জীবনের অন্যতম মহৎগুণ। সবরের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রকে সুষ্ঠু-সুন্দর, সার্থক ও প্রশান্তিময় করা যায়।

ব্যক্তি জীবনে সবর

ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি ও অবনতির ক্ষেত্রে সবরের ভূমিকা কম নয়। সৎভাবে জীবনযাপন করতে হলে নানা সংগ্রামের মুকাবিলা করতে হয়। কিন্তু অসৎভাবে জীবন যাপন করলে কোন বাধাই থাকে না। মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসা পেতে হলে এবং প্রভাব প্রতিপত্তি পেতে চাইলে সৎভাবে জীবন যাপনসহ পরোপকার ও অসীম ধৈর্যের সাথে বিদ্যার্জন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর সাধনা করতে হয়। সবর না থাকলে কোন অবস্থাতেই কেউ উন্নতি লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর কর এবং সবরের ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা কর। সবরের বন্ধনে নিজদিগকে আবদ্ধ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।"

সামাজিক জীবনে সবর

সমাজ জীবনে ও সবরের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, সমাজ-সভ্যতাকে সুপথে পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেককে ধৈর্যশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সমাজের অন্যায় অপরাধ রোধে, সকলের প্রতি সুবিচারে, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, সমজিদ, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণ এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক যে কোন কাজে বহু বাধা বিপত্তি দেখা দিতে পারে। তখন ধৈর্যসহকারে তা সম্পাদন করার মধ্যেই সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে। অন্যথায় ঝগড়া-বিবাদ মামলা-মোকদ্দমা ও খুন-খারাবিতে সমাজ মহাঅশান্তি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ধ্বংস হতে বাধ্য। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় সবরকারীগণকে অগণিত পুরস্কার দেয়া হবে।"

রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সবর

রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সবরের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। এ ক্ষেত্রে সবর বা ধৈর্যের অভাবে ধ্বংসের মহাযজ্ঞে পরিণত হয় মানব সভ্যতা। বিগত দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন দেশে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ পর্যালোচনা করলে তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ধৈর্যচ্যুতি ও সহনশীলতার অভাব ছাড়া এ সকল যুদ্ধের আর কোন কারণ দেখা যায় না। তাই যাবতীয় বিপদাপদ, হিংসা-বিদ্বেষ, চরম উস্কানি, আগ্রাসন, জাতিগত হানাহানি প্রভৃতির ক্ষেত্রে জাতি ও আন্তর্জাতিক যদি অসীম ধৈর্য সহকারে অবস্থার মোকাবিলা করতে পারেন– তবেই রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শান্তির আশা করা যায়। নচেৎ আজকের পারমাণবিক যুগে ধৈর্যচ্যুতির ফল আরো ভয়াবহ ও বীভিষিকাময় হতে বাধ্য। মহান আল্লাহ বলেন- "আল্লাহ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন, তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন"।

ধর্মীয় জীবনে সবর

অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ধর্মীয় জীবনেও সবরের গুরুত্ব অনেক। ধর্মের এমন কোন বিধিবিধান নেই যাতে সবরের প্রয়োজন নেই। ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন অসীম ধৈর্য। কেননা, আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করতে গেলে নিজের প্রবৃত্তি, আত্মীয়, পুত্র, স্বজন-পরিজন, সমাজ, রাষ্ট্র এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি থেকে বহু বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়। সে সময় সকল বাধার মুখে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হতে হলে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ ও রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহর ইবাদত করা সহজ কথা নয়।

মহান আল্লাহ বলেন- "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।" আল্লাহ আরো বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলগণকে অগণিত প্রতিদানে বিভূষিত করবেন"। (যুমার: ১০)

বিপদে-আপদে আল্লাহ ধৈর্যধারণ করতে এবং পরস্পর ধৈর্য অনুশীলন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্যধারণে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর"। (সূরা আলে ইমরান)

ঈমানের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে সবর তার মধ্যে অন্যতম। হাদীসে এসেছে, "সবর ঈমানের অর্ধেক"।

যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্টে, বিপদে-আপদে, সহায়-সম্পদে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে চলে, সে ধৈর্যের বদলা স্বরূপ পরম কল্যাণ ও জান্নাত লাভে ধন্য হবে। মহানবী (স:) সু-সংবাদ দিয়ে বলেছেন, "ধৈর্য হল জান্নাতের ভান্ডারসমূহের ভান্ডার" এবং 'ধৈর্যের পুরস্কার জান্নাত"। আসলে ধৈর্য হল যাবতীয় সফলতার চাবিকাঠি।

বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর নির্দেশ ফরয কাজে ধৈর্য ধারণ করাও ফরয। তেমনি শরীয়ত পরিপন্থী কাজ প্রশ্রয় দেয়ার উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করা অন্যায় এবং হারাম কাজে ধৈর্য অবৈধ। অতএব, সুখ-দুঃখ, হাসি, আনন্দ-বিপদ আপদ-মুসীবতে শরীআত মত ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাহলেই মহান আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কার পাওয়া যাবে।

সারাংশ

সবর অর্থ ধৈর্য ধারণ করা, সহ্য করা বা বারণ কর। সব রকমের বিপদাপদে বা কোন বালা- মুসীবতে বিচলিত না হয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করে সহ্য করাকে সবর বলে। সবরের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন যেমন সুশৃঙ্খল হয়, তেমনি সমাজ জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সবর অবলম্বনের মাধ্যমে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বজায় থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৬

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সবর শব্দের আভিধানিক অর্থ-

ক) আদল প্রতিষ্ঠা করা　　খ) ধৈর্য ধারণ করা

গ) পক্ষপাতিত্ব করা　　ঘ) চিন্তা ভাবনা করা।

২. ধৈর্য ঈমানের কি?

ক) চাবি　　খ) মূল

গ) শাখা　　ঘ) অর্ধাংশ

৩. আমরা দুঃখের সময় ধৈর্য ধারণ করলেও কোন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে পারি না?

ক) সুখ-সম্পদের সময়　　খ) রোগ-শোকের সময়

গ) ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময়　　ঘ) অত্যাচারের সময়

৪. সবর কত প্রকার।

ক) ৪ প্রকার　　খ) ৭ প্রকার

গ) ৫ প্রকার　　ঘ) ৩ প্রকার

৫. ধৈর্য সফলতার কি?

ক) চাবিকাঠি　　খ) পথ

গ) দরজা　　ঘ) ঘর

২. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) আমরা দুঃখ-দারিদ্র্যের অগ্নি পরীক্ষায় ..... করতে পারলেও সুখ-সম্পদের ..... শয্যায় সবর করতে পারি না।

খ) রোগ-শোক, জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ-কষ্ট এ সবই আমাদের জন্য ..... স্বরূপ।

গ) মানুষের প্রবৃত্তি সদা-সর্বদা অন্যায়-অসত্য ও ..... প্রতি-প্ররোচিত ও ..... করে।

ঘ) সবর বেহেশতের ..... সমূহের মধ্যে অন্যতম ভান্ডার

ঙ) সৎ ভাবে জীবন যাপন করলে অসংখ্য জীবন সংগ্রামের ..... করতে হয়।

ছ) ধৈর্যের পুরস্কার .....।

৩। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

ক) ধর্মের এমন কোন বিধি-বিধান নেই যাতে সবরের প্রয়োজন হয় না।

খ) রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সবরের প্রয়োজনীয়তা নেই।

গ) ধৈর্য ধারণে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে হবে।

ঘ) ধৈর্যের পুরস্কার জান্নাত।

ঙ) যে ধৈর্য ধারণ করে সে গরিব হয়ে যায় এবং তার জীবনে দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না।

চ) ধৈর্য যাবতীয় সফলতার চাবিকাঠি।

৪। বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশের মিল করুন।

ক) সবর বা ধৈর্য মানব জীবনে	ক) সাথে আছেন
খ) নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য	খ) আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা কর
গ) নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের	গ) আর তাঁর কাছেই ফিরে যাব।
ঘ) তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে	ঘ) একটি মহৎ গুণ।
ঙ) তোমরা পরস্পর ধৈর্যের	ঙ) অনুশীলন কর

৫। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) সবর শব্দের অর্থ কি?

খ) সবর কত প্রকার?

গ) 'আস-সাবরু নিসফুল ঈমান' এর অর্থ কি?

ঘ) নবী করিম (স:) সবরকে কিসের ভান্ডার বলে আখ্যায়িত করেছেন?

ঙ) ধৈর্যের পুরস্কার কি?

চ) ধৈর্য সফলতার কি?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন।

(ক) সবর কী? সবর কাকে বলে?

খ) সবর কত প্রকার ও কী কী?

গ) ধর্মীয় জীবনে সবরের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

ঘ) আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে ধৈর্যের গুরুত্ব কতটুকু লিখুন।

‘আদল «‰Ÿœ‰

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ‘আদলের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- ‘আদলের গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- ‘আদলহীন সমাজের অসুবিধাগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

৭.৭.১ ‘আদল বা ন্যায়বিচার

‘আদল («‰Ÿœ‰) শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা করা। ন্যায় বিচার করা, ইনসাফ করা ইত্যাদি। ইসলামী শরীআতের পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘আদল বলা হয়, কোন বস্তুকে সমান অংশের অধিকারীদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া, যাতে কারো অংশ বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি না হয়। অর্থাৎ যার যতটুকু প্রাপ্য আছে তা আদায়ের জন্য যথাযথ সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নাম ‘আদল বা ন্যায়বিচার।

৭.৭.২ ‘আদলের গুরুত্ব

সামাজিক জীবনে ‘আদল বা ন্যায় বিচার তথা ন্যায়নীতি ইসলামের এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ যেরূপ ‘আদিল' ন্যায়বিচারক। মানব জাতিকে তাদের সামগ্রিক জীবনেও তিনি ‘আদল প্রতিষ্ঠা করার তাকিদ করেছেন। মহানবীর (স:) জীবনে এবং সাহাবাদের মধ্যে ‘আদল প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়।

মুসলিম সমাজে ‘আদলের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সমাজে ন্যায়ের শাসন এবং ন্যায়বিচার আছে সেখানে প্রত্যেকটি মানুষের জান-মাল মান-সম্মান ও অধিকারের নিরাপত্তা রয়েছে। অপর পক্ষে ‘আদলহীন সমাজে মানুষের জীবন পর্যন্ত নিরাপদ নয়। ‘আদল প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন -

إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা কর, তখন ‘আদলের সাথে কর” (নিসা)।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতা যেমন চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ছিনতাই, খুন-খারাবি, গুন্ডামী, হত্যা-লুণ্ঠন, জুলুম-অত্যাচার, অবিচার-ব্যভিচার, শোষণ-নিপীড়ন সন্ত্রাস ইত্যাকার কার্যকলাপ সমাজকে কলুষিত ও বিপর্যস্ত করে তোলে। এ সমস্ত অপরাধমূলক কার্যাবলিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে সে সমাজে অন্যায় ও অপরাধ প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করবে। ফলে সে সমাজে প্রশাসনব্যবস্থা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে। সে সমাজ আর মানুষের বাসোপযোগী থাকে না। সুতরাং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য ‘আদল প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ‘আদলের ভূমিকা

অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও লেনদেনে এবং সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ‘আদলের গুরুত্ব সীমাহীন। দ্রব্যসামগ্রীতে ভেজাল ওজনে কম বেশি করা, পণ্যের ত্রুটি গোপন করে বাজারজাত করা, ইত্যাকার ব্যবসায়িক অসাধুতা সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থার আন্তরায় এবং আদল এর পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

উচ্চারণ: ওয়া আউফুল কাইলা ওয়াল মিযানা বিল কিসতে

অর্থ: “তোমরা আদল বা ন্যায়বিচারের সাথে মাপ ও ওজন পরিপূর্ণ ভাবে দাও”।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

'আদল এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শুধু সামাজিক বা অর্থনৈতিক জীবনেই নয়, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থাকে মজবুত ও সুসংহত রাখতেও 'আদল প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। 'আদলের পরিপন্থী প্রশাসনব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই বেশী দিন টিকতে পারে না। আদলহীন প্রশাসনের উপর জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ফলে প্রশাসনিক অবকাঠামো ভেঙ্গে যায়। তাই প্রশাসনিক মজবুতী ও সুষ্ঠুতার জন্য 'আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য গঠনে 'আদল

সমাজের সকল কর্মকান্ড যদি 'আদল মাফিক হয়, তবে সমাজের প্রতিটি লোকের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। 'আদল বা ন্যায়দন্ডের ছায়াতলে সবাই ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলে

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ 'আদলের সাথে কাজ করার হুকুম করেছেন"।

তাই আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী বিচার কার্যে এবং সাক্ষ্য প্রদানে শত্রুমিত্র, বন্ধু-বান্ধব, নিকটাত্মীয়, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আপন-পর, উঁচু-নিচু, ইতর-ভদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার সাথে সমান আচরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা 'আদলের পরিপন্থী। এ আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى أَنْ تَعْدِلُوا-

উচ্চারণ: ফালা তাত্তাবিউল হাওয়া আন-তাদিলূ

অর্থ: "তোমরা আদল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ো না।"

বিচারাধীন ব্যক্তি নিকটাত্মীয় হলেও ন্যায় কথা বলতে হবে। আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

অর্থ: "যখন তোমরা বিচারের কথা বল, তখন ন্যায় কথা বলবে, যদিও বিচারাধীন ব্যক্তি নিকটাত্মীয় হয়।"

আল্লাহর সন্তোষ অর্জনে 'আদল

আদল শুধু মাত্র জাগতিক কল্যাণেই নয়-পরম স্রষ্টা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যও 'আদলের গুরুত্ব রয়েছে। 'আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন-

اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

উচ্চারণ: ই-দিলূ হুয়া আকরাবু লিত্ তাকওয়া

অর্থ: "তোমরা আদল কায়েম কর আর এটা তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী"। (মায়িদা-৮)

আদল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের ভালবাসা এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিত্বীন

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ আদল প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালবাসেন"।

আদল প্রতিষ্ঠাকারীর মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসেও বহু কথা এসেছে। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে 'আদল প্রতিষ্ঠাকারী আল্লাহর আরশের নিচে আশ্রয় পাবেন।

'আদল প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর নির্দেশ

সকল নবীকেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ

উচ্চারণ: কুল আ'মরা রাব্বী বিল্ কিস্তি

অর্থ: "আপনি (লোকদের) বলে দিন আমার প্রভু (আমাকে) ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।" (আ'রাফ:২৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন- "তোমাদের মাঝে আমাকে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (সূরা: শূরা : ১৫)।

মানব জীবনে 'আদল একটি মহৎগুণ। এটা মানবের পাস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা, এবং সুশাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

সারাংশ

'আদল অর্থ ন্যায়বিচার, ইনসাফ করা বা ভারসাম্য রক্ষা করা। কোন বস্তুকে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া, যাতে সামান্য কম-বেশি না হয়। অর্থাৎ প্রাপ্য হকদারদের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করে দেওয়ার নাম 'আদল। আর তা সমাজের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিজীবনের আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ নিরাপত্তামূলক পরিবেশ গঠনের অন্যতম মাধ্যম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) অপরাধমূলক কার্যাবলিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদি ..... ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তবে সে সমাজে ..... ও ..... প্রবণতা ..... ব্যধির ন্যায় বিস্তার লাভ করবে। ফলে সে সমাজে ..... ব্যবস্থা এবং শান্তি শৃঙ্খলা ..... পারে। সে সমাজ আর ..... বাসোপযোগী থাকে না।

খ) ..... পরিপন্থী প্রশাসনব্যবস্থা ..... দিন টিকতে পারে না। ..... প্রশাসনের উপর জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ফলে প্রশাসনিক ..... ভেঙ্গে যায়।

২। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

ক) সমাজের সকল কর্মকান্ড 'আদল মাফিক হওয়া উচিত।

খ) 'আদলের মাধ্যমে সমাজ কলুষিত হয়।

গ) নিকট আত্মীয়দের ক্ষেত্রে 'আদল বা ন্যায়বিচার করা যাবে না। তাদের পক্ষ নিতে হবে।

ঘ) আল্লাহ পাক 'আদল প্রতিষ্ঠাকারীকে পছন্দ করেন না।

ঙ) কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে 'আদল প্রতিষ্ঠাকারী আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবেন।

চ) যেখানে 'আদল নেই সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা নেই।

৩। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) 'আদল অর্থ কি?

খ) বিচার ফয়সালা করার সময় কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে?

গ) কোন কাজটি 'আদলের পরিপন্থী?

ঘ) 'আদল কিসের নিকটবর্তী?

ঙ) ইসলামী সমাজব্যবস্থার গোড়ার কথা কি?

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

ক) 'আদল কাকে বলে?

খ) 'আদলের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

গ) প্রশাসনের প্রতি জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে কেন?

ঘ) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আদলের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

৫। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক. 'আদল অর্থ কি?

১. মা-বাবার সেবা করা
২. আত্মীয়দের পক্ষ পাতিত্ব করা
৩. ন্যায়বিচার করা
৪. শালীনতা

খ. কোন বস্তু হকদারদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়াকে কি বলা হয়-

১. ওয়াদা পালন
২. তাকওয়া
৩. আমানত
৪. 'আদল।

গ. বিচারের ফয়সালার সময় কোন দিকটি অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে?

১. 'আদল
২. শান্তি
৩. পক্ষ পাতিত্ব
৪. চিন্তা

ঘ. আদল বা ন্যায়বিচার না থাকলে সমাজে কি সৃষ্টি হয়?

১. শান্তি
২. অশান্তি
৩. ন্যায়বিচার
৪. ইনসাফ।

ঙ. কিসের অভাবে সমাজে অন্যায় ও অপরাধ প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করে?

১. 'আদল বা ইনসাফ
২. গীবত বা পরনিন্দা
৩. হিংসা বা বিদ্বেষ
৪. ফিৎনা বা ফাসাদ

চ. 'আদল কিসের নিকটবর্তী-

১. ভদ্রতার
২. আমানতের
৩. সত্যবাদিতার
৪. তাকওয়ার

পাঠ ৮ শালীনতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- শালীনতার পরিচয় বলতে পারবেন।
- সুন্দর সমাজ গঠনে শালীনতার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- শালীনতার কল্যাণ এবং ব্যক্তি জীবনে এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৮.১ শালীনতার পরিচয়

শালীনতার শাব্দিক অর্থ মার্জিত হওয়া। বেশ-ভূষা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণে মার্জিত হওয়া। ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে নম্র-ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়া। অর্থাৎ যে আচরণে এবং বেশভূষায় সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাকে শালীনতা বলে।

শালীনতা ইসলামী সমাজ জীবনে সৌন্দর্যের ভিত্তি। একটি সুখী সমৃদ্ধশালী, পূত-পবিত্র ও সুশীল সমাজ গঠনে শালীনতা রক্ষা করে চলার গুরুত্ব সীমাহীন। মানব সমাজকে সুস্থ ও বিকারমুক্ত রাখতে হলে শালীনতা চর্চা অপরিহার্য।

৭.৮.২ সমাজ গঠনে শালীনতার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

শালীনতা হচ্ছে ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি। আর তাই ইসলাম মানুষকে মার্জিত, সুরুচিশীল, ভদ্র ও শালীন হওয়ার শিক্ষা দেয়। মূলত শালীনতা একটি সুস্থ-সুন্দর, পূত-পবিত্র সমাজব্যবস্থার নিয়ামক। একটি সুখী-সুন্দর, শান্তিময় সমাজ গঠনে শালীনতাপূর্ণ, রুচিসম্মত, মার্জিত বেশভূষা, চাল-চলন ও আচার-আচরণের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

শালীনতা না থাকার পরিণাম

মানুষের মধ্যকার পাশবিকতা ও পশু প্রবৃত্তিকে অবদমনের জন্যও শালিনতা অপরিহার্য। কেননা, অশালীন বেশভূষা ও আচার-আচরণ মানুষের মধ্যকার পশুবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। কুৎসিত কামনাকে উত্তেজিত করে। তখন মানুষ যে কোন গর্হিত কাজ করতে দ্বিধা করে না। আর শালীনতা চর্চার মাধ্যমেই এসব অন্যায় থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

শালীনতা অনেক পাপাচার থেকে মানুষের জীবনকে পবিত্র রাখতে পারে। কেননা, অশালীন ও বেহায়াপনা নানা রকম পাপের পথ খুলে দেয়। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অশালীন ও কুৎসিত অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য করুণাময় আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। পুরুষেরা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে, লজ্জাস্থানগুলো যেন হিফাযত করে এবং নারীরা যেন নিজেদের বেশ-ভূষা, অলংকার ও গহনা অন্য পুরুষকে দেখিয়ে না বেড়ায় (সূরা নূর ৩০-৩১)। সূরা আহযাবে আল্লাহ শালীনতা রক্ষা করে চলার জনা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন-

"মেয়েরা যেন বহিরাবরণ সম্পর্কে সচেতন থাকে, তারা যেন অশালীনতার পথে পা না বাড়ায়।"

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শালীনতা

সামাজিক অনাচার, ব্যভিচার, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের কবল থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে শালীনতা অপরিহার্য। প্রাক্-ইসলামী যুগের ব্যভিচার-অনাচার ও অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য মহানবী (স:) পর্দা ও শালীনতা শিক্ষা দিয়েছেল। মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

"(হে নারীরা)! তোমরা নিজগৃহে অবস্থান করবে, আর অন্ধকার যুগের মেয়েদের মত বেশ-বিন্যাস করে বাইরে যাবে না।" (আহযাব: ৩)

কাজেই বিনা কারণে নারীদের বাইরে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। প্রয়োজনে বাইরে গেলে শালীনতা বজায় রেখে যেতে হবে।

ঈমানের পূর্ণতায় শালীনতা অন্যতম একটি উপাদান। ঈমানদার লোকেরা তাই শালীন ও লজ্জাশীল হয়ে থাকেন। মহানবী (স:) বলেন-

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ

অর্থ: "শালীনতা ঈমানের অঙ্গ"।

ঈমানদার লোকেরা জান্নাতে যাবে। আর অশালীনতা হল পাপ, আর পাপী ব্যক্তির আবাস হল জাহান্নাম। অর্থাৎ লজ্জাহীন, অশালীন ব্যক্তি জাহান্নামী। (তিরমিযী, আহমদ)

পুত-পবিত্র সমাজের জন্য নারী-পুরুষের চলা ফেরা-আচার-আচরণে শালীনতা একান্ত অপরিহার্য। উচ্ছৃঙ্খল ও উগ্র মানসিকতা নিয়ে বাধা বন্ধনহীনভাবে যে সমাজের নারী-পুরুষ চলতে থাকে, সে সমাজ সুস্থ ও পবিত্র থাকে না। নানারকম কুপ্রভাবে সমাজ সভ্যতা সংক্রামিত হয়ে পড়ে। এ জন্য মহানবী (স:) লজ্জা ও শালীনতাকে ঈমানের ভূষণ বলেছেন। মহানবী (স:) বলেন-

اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِى اِلَّابِخَيْرٍ

"শালীনতা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে।"

অন্য বর্ণনায় আছে-

اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

"শালীনতার সবটুকুই কল্যাণময়।" (বুখারী ও মুসলিম)

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রুচিশীল ও শালীন মার্জিত উত্তম পোশাক পরিধান করা কর্তব্য। কেননা, শালীনতার জন্য শালীন পোশাক অপরিহার্য। রাসূসুল্লাহ (স:) লা'নত করেছেন ঐ পুরুষকে যে মহিলার পোশাক পরিধান করে এবং লা'নত করেছেন ঐ নারীকে যে নারী কোন পুরুষের পোশাক পরে। (আবু দাউদ)

শালীনতা রুচিবোধের পরিচায়ক। শালীনতা হচ্ছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য মর্যাদার মাপকাঠি। বখাটেপনা কারো জন্য মর্যাদা বয়ে আনে না। ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য শালীন পোশাক পরা এবং শালীনভাবে চলাফেরা করা কথাবার্তায় এবং সকল কাজে শালীনতা রক্ষা করে চলা একান্ত অপরিহার্য।

সারাংশ

শালীনতা অর্থ মার্জিত হওয়া। কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও বেশ-ভূষায় মার্জিত ও ভদ্রতা রক্ষা করে চলার নাম শালীনতা। একটি সুন্দর ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি হল শালীনতা। শালীনতার মাধ্যমে সমাজের অন্যায়-ব্যভিচার, অত্যাচার বেহায়াপনাসহ সকল অপরাধ দূরীভূত করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৮

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

(ক) ইসলামী সমাজ জীবনে সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি কি?

১) ঝগড়া-বিবাদ ২) মিথ্যাচার
৩) নামায ৪) শালীনতা

খ) শালীনতা শব্দের অর্থ কি?

১) ন্যায়বিচার ২) সত্য কথা বলা
৩) মার্জিত হওয়া ৪) ধৈর্য ধারণ করা

গ) ঈমানদার শালীন ব্যক্তিরা কোথায় যাবে?

১) জান্নাতে ২) বিদ্যালয়ে
৩) বাজারে ৪) মদিনায় ও মক্কায়

ঘ) শালীনতা কি বয়ে আনে?

১) জান্নাত ২) জাহান্নাম
৩) ঘৃণা ৪) কল্যাণ

ঙ) শালীনতার অভাবে সমাজে কি দেখা দেয়?

১) শান্তি-শৃঙ্খলা ২) সাম্য-মৈত্রী
৩) অন্যায়-ব্যভিচার ৪) ভ্রাতৃত্ব।

২। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুনঃ

(ক) শালীনতা একটি মহৎগুণ।
খ) যে সমাজে শালীনতা আছে সে সমাজে শান্তি থাকে না।
গ) শালীনতার অভাবে সমাজে পাপাচার বেড়ে যায়।
ঘ) বিনা প্রয়োজনে নারীদের বাইরে যাওয়া উচিত নয়।
ঙ) নারী-পুরুষ সবার জন্য একই পোশাক পরিধান করা উচিত।
চ) মহানবী (স) শালীনতাকে ঈমানের ভূষণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করুন।

ক) নারীরা যেন নিজগৃহে	ক) মার্জিত হওয়া
খ) শালীনতা	খ) কল্যাণ
গ) শালীনতা মানে	গ) অবস্থান করে
ঘ) নারী পুরুষ সবাই	ঘ) ঈমানের অঙ্গ
ঙ) শালীনতার সবটুকুই	ঙ) তাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে

৪। এক কথায় উত্তর দিন।

(ক) শালীনতা অর্থ কি?
খ) ইসলামী জীবনে সৌন্দর্যের ভিত্তি কি?
গ) কোন গুণের অভাবে মানুষের পশুবৃত্তি ও কুৎসিত কামনা উত্তেজিত হয়?
ঘ) কুরআনে কোন কোন পথে পা না বাড়াবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে?
ঙ) নারীরা প্রয়োজনে বাইরে গেলে কিভাবে যাবে?
চ) শালীনতা বিবর্জিত, নির্লজ্জ ব্যক্তির অবস্থান হবে কোথায়?

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন।

ক) শালীনতার পরিচয় দিন?
খ) শালীনতার সামাজিক গুরুত্ব লিখুন।
গ) অশালীন ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা করুন।
ঘ) শালীনতার ব্যাপারে ইসলামের বিধানগুলো আলোচনা করুন।

আত্মশুদ্ধি (তাসাউফ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য বলতে পারবেন।
- আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে সফলতা অর্জন করা সম্ভব তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- আত্মশুদ্ধির অভাবে কি সমস্যা হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.৯.১ আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধির অর্থ হল- নিজেকে সংশোধিত করা, পূত-পবিত্র ও কলুষ মুক্ত রাখা। ইসলামের পরিভাষায়- সব রকমের পাপ-পংঙ্কিলতা, কলুষতা ও অনৈসলামিক কর্মকান্ড থেকে নিজেকে মুক্ত ও পূত-পবিত্র রাখা এবং নিজেকে সংশোধন করাকে আত্মশুদ্ধি বা 'তাযকিয়া-ই-নফ্স' বলা হয়। তাযকিয়া-ই-নফস বা আত্মা পরিশুদ্ধির ব্যতীত মানুষ পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না অর্থাৎ তাসাউফের উচ্চতম সোপানে উপনীত হতে পারে না।

৭.৯.২ আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। সমগ্র সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মানবজাতির জন্য তাঁর প্রভুর পরিচয় জানা এবং প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী জীবন পরিচালনা করা প্রয়োজনীয়। আর এর মধ্যেই মানব জাতির শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে। মানুষের সমাজ সভ্যতাকে সুন্দর করার পূর্বশর্ত হচ্ছে নিজের পরিশুদ্ধতা, নিজেকে পূত-পবিত্র রাখা। মন্দ পথে চললে, খারাপ কাজ করলে আত্মা কলুষিত হয়। আর ভাল পথে চললে ভাল কাজ করলে আত্মা পূত-পবিত্র ও কলুষমুক্ত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন-

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

উচ্চারণ: কাল্লা বাল রানা আলা কুলুবিহিম

অর্থ: "পাপের কারণে তাদের আত্মা কলুষিত হয়েছে"।

তাই আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখতে হলে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পাপ-পংকিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হয়। আর আত্মশুদ্ধি বা আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখার মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের সাফল্য।

আল্লাহ বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

উচ্চারণ: ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা ওয়াক্বাদ খাবা মান দাচ্ছাহা।

অর্থ: "যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখল, সে সাফল্য লাভ করল। আর যে ব্যক্তি আত্মাকে কলুষিত করল সে ধ্বংস হয়ে গেল"। (সূরা শামস ১০-১১)

আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পূত-পবিত্র এবং শক্তিশালী করতে হলে আল্লাহর যিকির ও সালাত আদায় করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলেন-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থ: "আল্লাহর স্মরণেই অন্তরাত্মা প্রশান্তি মিলে"। (সূরা রা'দ : ২৮)

মহানবী (স) বলেন- "মানব দেহে এমন এক টুকরা মাংস আছে, সে মাংস টুকরা যখন- পবিত্র হয়, তখন সমস্ত দেহই পবিত্র হয়। আর সে মাংস টুকরা যখন অপবিত্র হয়ে পড়ে, তখন সমস্ত দেহই অপবিত্র হয়ে যায়। আর তা হল- কালব বা অন্তর"। (বুখারী, মুসলিম)

তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত গুণাবলি অর্জন করা সহজ হয়। এর মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা, আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার মৌলিক গুণাবলি অর্জনের কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ইসলাম পূর্বযুগে যে আরবরা সারা বছরই ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যা-ব্যভিচার প্রভৃতি পাপাচারে লিপ্ত থাকত, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তারা একটি সুসভ্য, সুসংগঠিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, মৌলিক মানবীয় গুণাবলি, স্নেহ, মায়া-মমতা, সৌহার্দ-সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি সদগুণে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। এ সবই তারা আত্মা পরিশুদ্ধতার কারণেই করতে পেরেছে।

বিশুদ্ধ অন্ত:করণ মানুষকে পরকালীন মুক্তি এনে দেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

অর্থ: "যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না (সে দিন সেই-ই মুক্তি পাবে) যে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ অন্ত:করণ নিয়ে আসবে"। (সূরা শুআরা ৮৮-৮৯)

মহান স্রষ্টা আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিতে আত্মশুদ্ধি একান্ত অপরিহার্য। মানবাত্মাপূত-পবিত্র না হলে-পরমাত্মাআল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারে না। পরমাত্মা সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হলে মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করে উচ্চতম ও যোগ্যতম করে গড়ে তুলতে হবে। আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারলে মানবাত্মাপরলোকে পরমাত্মামহান আল্লাহর দিদার ও দর্শন লাভে ধন্য হবে। আল-মারূফ আল-কারখী বলেন, "সুফিবাদ ঐশি সত্তার উপলব্ধির মাধ্যম"। জুননুন মিসরী (র) বলেন- "খোদা ছাড়া আর সবকিছু পরিমার্জন করাই সুফীবাদ"। মহান সত্তা আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনই আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য।

নেক আমলকে আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় করার জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন-

وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

অর্থ: "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে"।

মহানবী (স:) বলেন- তোমরা এমন অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ । আর যদি মনে কর তোমরা আল্লাহকে দেখছ না তবে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে দেখছেন।

ঈমানকে সুদৃঢ় ও মজবুত করার জন্যও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। কেননা, যত অসুবিধা হোক না কেন, ঈমানের ওপর অটল থাকা খুবই জরুরি। এটা আত্মশুদ্ধি ব্যতীত সম্ভব নয়। মহানবী (স:) বলেন, "যদি তোমাকে হত্যা করে বা আগুনে পোড়াতে চায়, তবুও তুমি শিরক করো না।"।

আত্মশুদ্ধির প্রধান তাৎপর্য হচ্ছে, অন্তরকে যাবতীয় পাপের কালিমা থেকে মুক্তকরণ। মানুষের অন্তরে পাপের রোগ থাকে, সে রোগকে দূর করতে হয়। মহানবী (স:) বলেন, মুমিন যখন কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে। যখন সে তাওবা করে এবং ক্ষমা চায় তখন তা দূর হয়ে যায়।

আত্মা উন্নতি, বিকাশসাধন ও প্রশান্তিলাভের জন্য আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য। পাপ-পংকিলতার দ্বারা মানুষের আত্মা শান্তি দূর হয়ে যায়। পাপ কাজ ও পাপ চিন্তা মানুষকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। তাই মানুষ সব সময় অশান্তিতে ভোগে। আল্লাহর স্মরণ ও আত্মা পবিত্রতা মানুষকে প্রশান্তি এনে দেয়। আল্লাহ বলেন- "আল্লাহ তাআলা যার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন, সে আল্লাহর নূরের আলোতে থাকেন।"

ইমাম গাযযালী (রহ:) বলেন, "আধ্যাত্মবিদ্যা এমনই একটি গুণ যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে মানুষকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।"

সুতরাং মানবিক গুণাবলি অর্জন ও পাশবিকতাসমূহ বর্জনের মাধ্যমে মানবাত্মা সাথে পরমাত্মা দিদার ও পরিচয় পাওয়ার জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। যেমন- তাওবা, তাওয়াক্কুল, সবর, ইখলাস, নিষ্ঠা, যোহদ, শোকর ও নির্জন নানা-সাধনা ইত্যাদি। আর পাশবিকতা হচ্ছে- লোভ-মোহ, রাগ-হিংসা, অহংকার ইত্যাদি। কাজেই পূর্ণাংঙ্গ মানুষ (ইনসানে কামেল) হওয়ার জন্য আত্মশুদ্ধির একান্ত দরকার। মন হচ্ছে আল্লাহকে পাবার একটা বড় মাধ্যম। এই

মনকে আল্লাহর দিকে প্রতিষ্ঠা ও নিবিষ্ট করার জন্য মনকে নরম করা প্রয়োজন। পরিশুদ্ধ আত্মা হৃদয়ের বিনম্রতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন-

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ

অর্থ: "করুণাময়ের (আল্লাহর) বান্দারা নরম প্রকৃতির হয়"।

বস্তুত মানুষ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মহৎ থেকে মহত্তর হতে পারে। আত্মার পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতাই মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষের সীমাহীন উচ্চাসনে আসীন করতে পারে। এরই মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিলন ঘটতে পারে। কাজেই আত্মশুদ্ধিই ইসলামের মূল দর্শন।

সারসংক্ষেপ

আত্মশুদ্ধি মানে আত্মা বা মনের পবিত্রতা। মন বা আত্মাকে সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে কলুষমুক্ত করার মাধ্যমে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করাকে আত্মশুদ্ধি বলে। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি যেমন আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে, তেমনি এর মাধ্যমে অন্তরকে পাপ ও কালিমা মুক্ত করে সার্বিক সফলতা লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৯

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) আত্মশুদ্ধিমানে নিজেকে ..... করা

খ) মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা .....।

গ) পাপের কারণে তাদের অন্তরসমূহ ..... হয়েছে।

ঘ) মানব দেহে এক টুকরা ..... আছে, সে মাংস টুকরা যখন যথার্থ রূপে ..... হয়, তখন সমস্ত ..... পবিত্র হয়। আর সে মাংস টুকরা যখন অপবিত্র হয় তখন সমস্ত দেহই ..... হয়ে যায়। আর তা হল ..... বা অন্তর।

২। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

ক) আত্মশুদ্ধি হল অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

খ) আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুতেই পরিমার্জন করা সুফীবাদ।

গ) মারতে চাইলে বা পোড়াতে চাইলে শিরক করা যাবে।

ঘ) বিশুদ্ধ অন্ত:করণে আল্লাহকে ডাকলে তিনি ডাকে সাড়া দেন।

ঙ) করুণাময় আল্লাহর বান্দারা কঠোর প্রকৃতির হয়।

চ) আত্মশুদ্ধিই ইসলামের মূল দর্শন।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) তাসাউফ অর্থ-

১. পার্থিব জগতের মোহ ত্যাগ করা ২. জ্ঞানার্জন করা

২. পৃথিবীর সব সম্পদের মালিক হওয়া ৪. কোনটিই নয়।

খ. তাযকিয়াতুন নফস শব্দের অর্থ-

১. নফসের গোলামী করা, ২. আত্মমর্মসংস্থান করা,

৩. আত্মশুদ্ধি, ৪. আত্মাভিমান

গ) খারাপ কাজ করলে আত্মা কি হয়?

১. কলুষমুক্ত হয়, ২. কলুষিত হয়, ৩. পরিশুদ্ধ হয়, ৪. পবিত্র হয়।

ঘ) আত্মাকে পবিত্র রাখলে কি লাভ করা যায়?

১. ঘৃণা, ২. অপমান ৩. সফলতা ৪. বীরত্ব

পাঠ ১০ স্বদেশপ্রেম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- স্বদেশপ্রেমের পরিচয় বলতে পারবেন।
- স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- কিভাবে দেশের সেবা করা যায় তা আলোচনা করতে পারবেন।

৭.১০.১ স্বদেশপ্রেম

মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি মানুষের কাছে খুব প্রিয়। এটা ইসলামের শিক্ষা। নিজ দেশকে ভালবাসা, নিজের দেশের সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করা ঈমানের দাবি। দেশের প্রতি নানা কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে প্রকৃত দেশপ্রেমের প্রমাণ রাখতে হয়।

স্বদেশ বলতে নিজ দেশ ও নিজ জন্মভূমিকে বুঝায়। নিজ জন্মভূমির প্রতি মানুষের ভালবাসা সহজাত। জন্মভূমির প্রতি মায়া-মমতা মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। জন্মভূমির প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি ও শৈশবের লীলাভূমির প্রতি মানুষের এ আকর্ষণ বা ভালবাসাকেই বলা হয় স্বদেশপ্রেম। স্বদেশের প্রতি মানুষের এ মায়া-মমতা ও আকর্ষণ শাশ্বত এবং চিরায়ত।

৭.১০.২ স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বদেশ প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বদেশের প্রতি মায়া-মমতা ঈমানের অঙ্গ। যেমন বলা হয়- - স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। হাদীসে আছে- "যারা নিজ মাতৃভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারায় বিনিদ্র রজনী কাটায়, তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত।"

যারা দেশকে ভালবাসেনা, দেশের কল্যাণের চিন্তা করে না, তারা চরম অকৃতজ্ঞ। আর যারা অকৃতজ্ঞ তারা প্রকৃত ধার্মিক নয়। তারা দেশদ্রোহী জঘণ্য চরিত্রের লোক। দেশ হিফাযত করতে না পারলে ধর্মকে হিফাযত করা যায় না। দেশের মানুষকে রক্ষা করা যায় না, দেশের স্বার্থ রক্ষা করা যায় না, কারণ ধর্ম পালন করতে হলে তো স্বাধীন দেশের প্রয়োজন। এ জন্য ইসলাম স্বদেশের প্রতি যত্ন নিতে, স্বদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য সুবিশেষ তাগিদ দিয়েছে।

৭.১০.৩ যেভাবে দেশের সেবা করা যায়

দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই স্বদেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশকে ভালবাসতে হলে দেশের জন্য কাজ করতে হয়। তেমনিভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার মাধ্যমে দেশের সেবা করা যায়। এ জন্য জিহাদ করা ফরয। দেশ রক্ষায়, দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে এবং শত্রু মুক্ত করার জন্য জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ-

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে, নিজেদের সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে"। (তাওবা: ৪১)।

দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে কাজ করার মাধ্যমে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করা, কাজে সাহায্য করা এবং বিশেষ বিশেষ অবদান রাখাই হচ্ছে সত্যিকারের দেশপ্রেম। দেশের স্বার্থে কাজ করতে গেলে ব্যক্তি স্বার্থ কিছুটা ক্ষুন্ন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে দেশকে বড় এ বিশ্বাস নিয়ে দেশপ্রেমের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে দূরে ঠেলে জাতীয় স্বার্থে কাজ করতে হবে।

দেশকে ভালবাসার পূর্বশর্ত হল দেশের মানুষকে ভালবাসা। দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করাই সত্যিকার স্বদেশপ্রেম। সম্ভাব্য উপায়ে দেশের মানুষের জন্য কাজ করা প্রমাণ করে, স্বদেশপ্রেমের গভীরতা কতটুকু। খাঁটি মুমিন হিসেবে দেশের শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা এবং ত্যাগ স্বীকার করা কর্তব্য। এগুলো দেশপ্রেমের প্রমাণ। দেশের নাগরিক হিসেবে কোন রকম দৃষ্কৃতি না করা এবং দেশের শত্রু চোরাচালানী, কালোবাজারী, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারী, সন্ত্রাসী এবং দেশের স্বার্থবিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে রুখে দাড়াঁনোর মাধ্যমেই দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে।

পরিশেষে এ কথা স্পষ্ট যে, দেশপ্রেম মানুষের সহজাত হলেও তা মানবীয় গুণের এক অন্যতম দিক, যা জাতীয় ও ধর্মীয় অনুভূতির এক অনন্য প্রকাশ। তাই আমরা আমাদের স্বদেশকে সোনার দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। এটা আমাদের ঈমানী দায়িত্বও বটে।

সারাংশ

জন্মভূমির প্রতি মানুষের যে আশৈশব আকর্ষণ, প্রেম ও ভালবাসা, তাকেই বলা হয় দেশপ্রেম। দেশপ্রেমের মাধ্যমেই গড়ে উঠে একটি ভৌগোলিক ঐক্য ও সংস্কৃতি। আর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমেই দেশপ্রেমের প্রমাণ মিলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১০

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) স্বদেশ বলতে কি বুঝায়?

১. নিজ জন্ম ভূমি ২. নিজ গ্রাম

৩. বিদেশ ৪. উপদেশ

খ) দেশপ্রেম ঈমানের কি?

১. বহিঃপ্রকাশ ২. আত্মপ্রকাশ

৩. অঙ্গ ৪. অস্থি

গ. যারা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বিনিদ্র রাত সীমান্ত পাহারায় কাটায় তাদের জন্য কি রয়েছে?

১. শান্তি ২. সম্পদ ৩. জান্নাত ৪. জাহান্নাম।

ঘ) কি দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে?

১. বন্দুক নিয়ে ২. ছুরি বা তলোয়ার নিয়ে

২. বন্ধুদের নিয়ে ৪. জীবন ও সম্পদ নিয়ে

ঙ) দেশপ্রেমের পূর্বশর্ত কি?

১. মানুষকে ঘৃণা করা ২. মানুষকে ভালবাসা

৩. দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো ৪. ঝগড়া করা

চ) দেশের ও দশের কল্যাণে কাজ করাকে কি বলে?

১. কল্যাণ ২. অকল্যাণ

৩. দেশপ্রেম ৪. আনন্দ।

ছ) দেশ ও ধর্ম রক্ষার জন্য জিহাদ করা কি?

১. ঐচ্ছিক ২. ফরয

৩. ঈমান ৪. আমল

২। সত্য হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক) দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ

খ) মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি সকল মানুষের প্রিয়।

গ) স্বদেশপ্রেমের প্রমাণ হল- দেশের জন্য কাজ না করা।

ঘ) দেশের মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে দেশপ্রেমের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঙ) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে চোরাচালানী ও কালো বাজারীদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ..... প্রেম ঈমানের অঙ্গ

খ) তোমরা জিহাদ কর ..... পথে, নিজেদের ..... ও জান প্রাণ দিয়ে।

গ) দেশকে ভালবাসার পূর্বশর্ত হল দেশের ..... কে ভালবাসা।

ঘ) তাদের বহিষ্কার ..... থেকে, যেখান থেকে তারা তোমাকে ..... করেছে।

৪। এক কথার উত্তর দিন।

ক) কোন্ তিনটি বস্তু সবার প্রিয়?

খ) অর্থ কি?

গ) দেশপ্রেমের প্রমাণ কি?

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন।

ক) স্বদেশপ্রেম বলতে কি বুঝেন?

খ) স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কী?

গ) স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ১১ হালাল উপার্জন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হালাল উপার্জন কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হালাল উপার্জনের লক্ষ্য বলতে পারবেন।
- হালাল উপার্জনের গুরুত্ব এবং উপকারিতা আলোচনা করতে পারবেন।
- হালাল উপার্জনের উপায় বলতে পারবেন।

৭.১১.১ : হালাল উপার্জন

হালাল উপার্জন মানে বৈধ উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয় উপার্জন করা হয় তাকে হালাল উপার্জন বলে। হালাল উপার্জন সকলের জন্য কল্যাণকর। নিজের জন্য যেমন কল্যাণকর তেমনি সমাজের জন্যও। ইসলাম আয়-রোজগারের অবৈধ পন্থাগুলোকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। আর অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদকে অপবিত্র ও নাপাক বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করে তাদেরকে দান করেছেন উন্নত বিবেক-বিবেচনা ও আত্মা দেহ সুস্থ রাখার জন্য যেমন জীবিকার প্রয়োজন, তেমনি আত্মা কল্যাণের জন্য হালাল জীবিকা তথা হালাল উপার্জন অপরিহার্য। হালাল উপার্জনের ওপরই বান্দার আত্মাপবিত্র থাকে এবং ইবাদত বন্দেগী কবুল হয়।

৭.১১.২ : হালাল উপার্জনের লক্ষ্য

ক) দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তিলাভ

খ) উপার্জিত সম্পদ দ্বারা বৈধ পন্থায় পৃথিবীতে নিজের প্রয়োজন পূরণ।

গ) উপার্জিত সম্পদ দ্বারা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ সাধন।

ঘ) অর্থ সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে পৃথিবীতে যে সব অশান্তি ও বিপর্যয় আছে তা দূর করার ব্যবস্থা করা।

ঙ) আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

৭.১১.৩: গুরুত্ব ও উপকারিতা

হারাম ও অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দ্বারা গড়া শরীর জাহান্নামের ইন্ধন হবে। মুসলিম হিসেবে হালাল উপার্জন আমাদের ঈমানের দাবি। হালাল পন্থায় উপার্জিত অর্থই মূলত মানব কল্যাণমূলক অর্থ। আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদত বন্দেগীর জন্য। ইবাদত করা যেমন ফরয, তেমনি হালাল উপার্জন বা হালাল রুজি অন্বেষণ করাও ফরয। আল্লাহ নির্দেশ- সালাত আদায় হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়- আর আল্লাহর অনুগ্রহে জীবিকা অন্বেষণ কর তথা উপার্জন কর। (সূরা-জুমুআ)

মহানবী (স:) বলেছেন

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَالْفَرِيْضَةِ

অর্থ: "হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা ফরযের পরেও একটি ফরয।"।

ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন অপরিহার্য

ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হল হালাল রুযি। যার রুযি হালাল নয় তার যাবতীয় ইবাদত- সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত কোন কিছুই কবুল হয় না। কাজেই বুঝা যায় যে, ঈমানের পরই হালাল উপার্জন, হালাল জীবিকা ভক্ষণ এবং হালাল বস্ত্র পরিধান করাও ফরয। মহানবী (স:) বলেছেন- "দু হাতে উপার্জিত

হালাল খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই।" মহানবী (স:) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি হালাল রুযি দ্বারা তার পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের চেষ্টা করে থাকে সে আল্লাহর পথে মুজাহিদের ন্যায়।"

ইসলাম হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। হালাল উপার্জন ব্যতীত ঈমানদার হওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।" (সূরা বাকারা : ১৮৮)

শ্রমের দ্বারা হালাল উপায়ে অর্জিত খাদ্যই সর্বোত্তম খাদ্য। মহানবী (স:) বলেন-

مَاأَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا أَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

অর্থ: "দু হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কেউ কোন দিন খায়নি"। (বুখারী)

হালাল উপার্জন করতে হলে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়। বসে বসে বা অবৈধ উপায়ে উপার্জনে তেমন কোন কষ্ট নেই। কিন্তু হালাল উপার্জনের জন্য সময় মেধা, শ্রম, সবকিছুই তিলে তিলে ব্যয় করতে হয়। এতে মানুষের মাঝে কর্ম বিমুখতা দূর হয়। অলসতা ও কুঁড়েমি তার কাছে ঘেঁষতেও পারেনা। মহানবী (স:) বলেন-

إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَلَا تَنَامُوْا عَنْ طَلَبِ أَرْزَاقِكُمْ

অর্থ: "তোমরা যখন ফজরের নামায শেষ করবে তখন জীবিকা অন্বেষণ না করে ঘুমিয়ে পড়ো না।"

তাই বলা যায় যে, হালাল উপার্জন করা একদিকে যেমন মুমিনের দায়িত্ব, অন্যদিকে তেমনি হালাল উপার্জন তাঁর অধিকার। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। নিজ হাতে উপার্জন করে পৃথিবী থেকে নিজের প্রাপ্যটা অবশ্যই ভোগ-ব্যবহার করা কর্তব্য। অপরের আয়-রোজগারের দিকে চেয়ে থাকা বা অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকা মুমিনের জন্য শোভা পায় না। মহান আল্লাহ বলেন-

لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

অর্থ: "তুমি পার্থিব প্রাপ্যটা গ্রহণ করতে ভুলে থেকো না।"

হালাল উপার্জন নবী-রাসূলের কাজ

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন তাঁরা সকলেই নিজ হাতে হালাল উপার্জন করার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। তাই হালাল উপার্জন সকল নবী-রাসূলেরই সর্বজনীন সুন্নাত। রাসূল (স:) বলেছেন- "আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনিও কি তাঁদের মত? তিনি বললেন, হাঁ! আমি কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল ভেড়া চরাতাম" (বুখারী)। মহানবী (স:) হালাল উপার্জনের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের উত্তরাধিকারীগণকে পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে সচ্ছল ও বিত্তবান রেখে যাওয়া উত্তম।" আর এ জন্য হালাল উপার্জন অপরিহার্য। নবীগণের নির্দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি নির্দেশ। এরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ পাক সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে (হালাল উপার্জনকে) বৈধ করেছেন"।

হালাল উপার্জনের জন্য খলিফা হযরত উমর (র:) কঠোরভাবে নির্দেশ দান করে বলেন-

"তোমরা কেউ জীবিকার্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহ হয়ে বসে থেকো না।"

৭.১১.৪ হালাল উপার্জনের উপায়

হালালভাবে উপার্জন করার বেশ কিছু পন্থা বা পদ্ধতি আছে। তা হল-

১. কায়িক শ্রম : কায়িক শ্রমের মধ্যে বহু কাজ আছে যার মাধ্যমে হালাল উপার্জন করা যায়। তবে এমন কোন কাজ করা যাবে না, যে কাজ বৈধ নয়।

২. চাকরি করা: সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চাকরি করে হালাল উপার্জন করা যায়।

৩, ব্যবসায়-বাণিজ্য : আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন। মহানবী (স:) বলেন, "ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে রিযিকের দশ ভাগের নয় ভাগ জীবিকা রয়েছে।" কাজেই বৈধভাবে বৈধ জিনিসপত্রের ব্যবসায়-বাণিজ্য করে হালাল উপার্জন করা যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্য সৎভাবে করার ফযীলতও অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, "সৎ ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সঙ্গী হবেন।"

৪. অন্যান্য বৈধ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে: চাকরি-বাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়াও হালাল উপার্জনের বহু পন্থা রয়েছে, নতুন নতুন বৈধ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে হালাল উপার্জন করা যায়। যেমন-

পশু পালন করার মাধ্যমে।
হাঁস-মুরগির খামার করার মাধ্যমে।
মাছের চাষ করার মাধ্যমে।
বৃক্ষ রোপণ করার মাধ্যমে।
ছোট, বড়, মাঝারি ধরনের নার্সারি করার মাধ্যমে।

নানা রকম কুটির শিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান গড়ে তোলা যায়। এ সব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যেমন আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায় তেমনি দেশ-জাতি ও সমাজের প্রভূত উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা সম্ভব।

সারাংশ

কায়িক পরিশ্রম বা অন্য কোন উপায়ে বৈধ পন্থায় ইসলামের নির্দেশিত পথে উপার্জন করাকে হালাল উপার্জন বলে। এক কথায় যে উপার্জন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় হয় তাই হালাল উপার্জন। আর তা মুমিনের অধিকার, ইসলামের নির্দেশ এবং ইহ-পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সফলতার উপায়। ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) অবৈধ পন্থায় আয়-রোজগার করা কি?

১. হালাল	২. হারাম
৩. ফরয	৪. নাপাক

খ) হালাল উপার্জন মানে-

১. বৈধ উপার্জন	২. অবৈধ উপার্জন
৩. আত্মসাৎ করা	৪. ধূলিসাৎ করা

গ) হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দ্বারা গড়া শরীর কোথায় যাবে?

১. বাড়িতে	২. শহরে
৩. জান্নাতে	৪. জাহান্নামে

ঘ) সালাত আদায়ের পরে যমিনে ছড়িয়ে পড়ে কি করতে হবে?

১. ঝগড়া বিবাদ করতে হবে	২. চিন্তা করতে হবে

৩. রাস্তা-ঘাট তৈরি করতে হবে ৪. হালাল উপার্জন করতে হবে

ঙ) কোন খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ খায়নি?

১) দু'হাতের উপার্জন ২) চুরি করে উপার্জন

৩) তাজা ফল ৪) ভাত মাছ।

২। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

ক) মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব।

খ) হালাল উপার্জন দ্বারা পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করা যায় না।

গ) ইবাদতের ন্যায় হালাল উপার্জনও ফরয।

ঘ) হালাল উপার্জনে কল্যাণ আর হারাম উপার্জনে বয়ে আনে অকল্যাণ।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন।

ক) হালাল উপার্জন কাকে বলে?

খ) হালাল উপার্জনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী?

গ) হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

ঘ) হালাল উপার্জনের কি কি উপায় রয়েছে লিখুন।

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হল .....।

খ) দু'হাতে উপার্জিত ..... খাদ্য অপেক্ষা উত্তম ..... আর নেই।

গ) ..... উপার্জন সকল নবী-রাসূলের সর্বজনীন .....।

সৎসঙ্গ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সৎসঙ্গ মানে কি তা বলতে পারবেন।
- সৎসঙ্গের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বন্ধু নির্বাচনে কতটুকু সতর্ক হওয়া দরকার তা আলোচনা করতে পারবেন।
- সৎসঙ্গ কার সাথে হবে তার গুণাবলি কি হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.১২.১ সৎসঙ্গ

সৎ শব্দের অর্থ-সাধু, ন্যায়পরায়ণ, সত্যজন, ভাললোক, সততার সাথে কাজ করেন যিনি ইত্যাদি। আর সঙ্গ অর্থ মিলন, মিলিত হওয়া শব্দের একত্র হওয়া, এক সাথে চলা, বন্ধু, সাথী বা সহযোগী, যার সাথে সাহচর্য আছে এমন। তাই সৎসঙ্গ হল ভাল, পুণ্যময় চরিত্রের লোকের সাথে একত্রিত হওয়া। যাদের চরিত্র ভাল, কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত নয়, লোভী বা অত্যাচারী নয় কিংবা পাপ পংকিলতায় লিপ্ত নয় এমন পরোপকারী চরিত্র সম্পন্ন লোকের সাথে একত্র হয়ে বা মিলে মিশে চলাকে সৎসঙ্গ বলে। সৎ সঙ্গ মানব জীবনকে চারিত্রিক উৎকর্ষের উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। তেমনি অসৎ সঙ্গ ডেকে আনে ধ্বংস।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে চলতে হলে কেউ সম্পূর্ণ একাকী চলতে পারে না। বহু মানুষের সহযোগিতা ও সাহচর্যে প্রয়োজন। সঙ্গীহীন, নিঃসঙ্গ একাকী জীবনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তাই তার জন্য চাই- সঙ্গী, বন্ধু, সহকর্মী, সহযোগী বা সহযাত্রী। তবে এই সঙ্গী হতে হবে সৎ মানুষ। সঙ্গী বা বন্ধু ভাল না হলে জীবন-জগত ও পরকালের সবই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই ইসলামও সঙ্গী নির্বাচনে, সৎসঙ্গ লাভে, সৎসঙ্গের সাহচর্যে থাকার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে।

৭.১১.২ গুরুত্ব

পার্থিব জীবনে কোন মানুষই বন্ধু সঙ্গীর সাহচর্য বা প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাই সঙ্গী যদি ভাল হয়, বন্ধু যদি চরিত্রবান হয়, সাথী যদি আদর্শবান হয়, তবে সহযাত্রী বা অপর সঙ্গীও ভাল হতে বাধ্য। অপর দিকে সঙ্গী যদি অসৎ হয়, তবে সাথী ও চরিত্রহীন হয়ে যাবে। মহানবী (স:) বলেন-

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُّخَالِلْ

অর্থ: "লোক তার সঙ্গীর স্বভাব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। অতএব সে যেন খেয়াল রাখে কার সাথে সে বন্ধুত্ব করছে।"

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস- অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। তাই জীবনকে সুন্দর করতে হলে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। অসজ্জনের সাথে সম্পর্ক রেখে কখনও ভাল হওয়ার আশা করা যায় না। মানুষ অনুকরণ প্রিয় অন্যকে অনুসরণ করতে ভালবাসে। এক্ষেত্রে আপনজন তথা বন্ধু বা সাথীকেই সে বেশি অনুসরণ করে। তাই সঙ্গী যদি ভাল হয়, সৎ হয়, চরিত্রবান হয়, তার কাজকর্ম যদি আদর্শিক হয়, তবে সেও তার সাথে মেলা-মেশার কারণে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ভাল কাজ করতে তার আগ্রহ জন্মে। তাই চরিত্র গঠনে, আদর্শ জীবন ঠিক রাখতে সৎসঙ্গের বিকল্প নেই। তেমনিভাবে অন্যায় থেকে বিরত থাকতে, ধ্বংস হতে বেঁচে থাকার জন্য অসৎসঙ্গ অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

সঙ্গী যদি সৎ হয় তবে তার প্রভাবে অপর জনও সৎ হয়ে যায়। আর সঙ্গী যদি অসৎ হয় তবে নিজের চরিত্রও ধরে রাখা যায় না। কারণ, শয়তান সব সময় অন্যায় কাজকে আমাদের চোখে সুন্দর ও চাকচিক্যময় করে তোলে। আর সে জন্যই মানুষ অন্যায় করে আনন্দ পায়, খারাপ কাজ করতে ভাল লাগে, খারাপের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে। তাই

বন্ধুর চরিত্র খারাপ হলে নিজ চরিত্রও খারাপ হতে বাধ্য। তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি হাশরের দিন তার বন্ধুর সাহচর্য লাভ করবে। নবী করীম (স:) বলেন-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে ব্যক্তি কোন জাতির বেশভূষা ও চাল চলনের অনুকরণ করবে সে ঐ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হবে।"

কিয়ামতের শেষ বিচারের দিন হাশর হবে তার বন্ধুর সাথে। ইমাম গাযযালী (রহ:) উল্লেখ করেন- "যে দু ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করে- তাদের একজনের মর্যাদা উচ্চ হলে অপরজনের মর্যাদাও উচ্চ করা হবে এবং তাকে প্রথমজনের সাথে সংযুক্ত করা হবে।" মহান আল্লাহ বলেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সৎ লোকদের সঙ্গী হও"। (সূরা তওবা: ১১৯)

যারা অসৎ, ঝগড়াটে, অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত, কিংবা অবিশ্বাসী, কপট প্রকৃতির, তাদের সংস্পর্শ, সংসর্গ, সাহচর্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য।

বন্ধু বা সঙ্গী নির্বাচনের পূর্বে তাকে ভালভাবে দেখে শুনে পরখ করে নিতে হবে। অন্যথায় এর পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ হতে বাধ্য। মহানবী (স:) এ বলেন-

"অসৎ সঙ্গীদের চেয়ে একাকীত্ব ভাল। আর একাকীত্বের চেয়ে সৎ সঙ্গী উত্তম।" হাদীসে এসেছে- "হাশরের ভয়াবহ দিবসে ঐ দু'ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে- যে দু'ব্যক্তি পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে, আল্লাহর জন্য উভয়ে একত্র হয় এবং তাঁর জন্যই আলাদা হয়।"

৭.১১.৩ সৎসঙ্গী কেমন হবে

সঙ্গী হতে হবে সৎ, চরিত্রবান। ইমাম গাযযালী (রহ:) সৎসঙ্গী বলেন, পাঁচটি গুণের উপর ভিত্তি করে সৎসঙ্গী নির্বাচন করতে হবে। যথা-

১. **বুদ্ধিমত্তাঃ** সঙ্গী হতে হবে বুদ্ধিমান, কারণ নির্বোধ লোকের সাহচর্যে কোন কল্যাণ নেই। প্রবাদ আছে 'নির্বোধ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল'

২. **সৎ স্বভাব ঃ** যার স্বভাব চরিত্র ভাল নয় এমন লোকের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা, অসৎ বন্ধুর প্রভাবে ব্যক্তি নিজেও অসৎ হয়ে যাবে।

৩. **পাপাচারী না হওয়া ঃ** যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকা যায় না। তার কথায় বিশ্বাস করা যায় না। কাজেই পাপী, দুরাচারী, বন্ধু হতে পারে না। আল্লাহ বলেন-

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

"তার আনুগত্য করো না- যার অন্তর আমার (আল্লাহর) স্মরণ শূন্য।" (সূরা কাহফ : ২৮)

৪. **বিদআতী না হওয়া ঃ** যে ব্যক্তি কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী কাজে লিপ্ত সে-ই বিদআতী। এমন লোকের সাহচর্য গ্রহণ করা যাবে না।

৫. **দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হওয়া ঃ** যে ব্যক্তি পরকালের চেয়ে দুনিয়াকে বেশি প্রাধান্য দেয় এবং এ জন্য যে কোন পাপে লিপ্ত হয় তার সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না। আল্লাহ পাক বলেন, "মুখ ফিরিয়ে নিন- সেই ব্যক্তি থেকে যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কেবল পার্থিব জীবন কামনা করে"। বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক করে ইমাম জাফর সাদিক (র:) বলেন- (১) মিথ্যাবাদী (২) নির্বোধ (৩) ভীরু (৪) পাপাচারী (৫) কৃপণ- এ পাঁচ শ্রেণীর লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো না। আল্লাহ বলেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَا اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের (অভিন্ন) শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" অপর দিকে মুমিন সৎবন্ধু গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ

" যে আমার প্রতি নিবেদিত আপনি তার পথ অনুসরণ করুন।"

অতএব আমরা সৎসঙ্গ গ্রহণ করব। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করব। সৎজনের সাথে মিশে নিজেকেও সৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব।

সারাংশ

সৎসঙ্গ অর্থ-চরিত্রবান বন্ধু গ্রহণ। যে ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র ভাল, অন্যায় করে না, পাপাচারিতায় লিপ্ত নয়, খোদাভীরু এমন লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করাকে সৎসঙ্গ বলে। সৎসঙ্গ ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর, নির্মল ও আদর্শিক করে আর অসৎ সঙ্গ ধ্বংস ডেকে আনে। কাজেই বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) সৎসঙ্গ মানে কি-
- ১. সৎ লোকের সাথে চলা
- ২. সত্য কথা বলা
- ৩. ন্যায়বিচার করা
- ৪. মিথ্যা না বলা

খ) মানুষ কার স্বভাব-চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়?
- ১. আত্মীয়-স্বজনের
- ২. প্রতিবেশীর
- ৩. সঙ্গী ও বন্ধুর
- ৪. শত্রুর

গ) শয়তান কোন কাজকে আমাদের চোখে চাকচিক্যময় করে?
- ১. পুণ্য কাজ
- ২. অফিসের কাজ
- ৩. ন্যায় কাজ
- ৪. অন্যায় কাজ

ঘ) কুরআনে কা'দের সঙ্গী হওয়ার উপদেশ রয়েছে?
- ১. সহপাঠীর
- ২. সৎলোকের
- ৩. আত্মীয়দের
- ৪. অসৎ লোকের

ঙ) সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গ কি হয়?
- ১. জান্নাত লাভ হয়,
- ২. জাহান্নামী হয়
- ৩. সাওয়াব হয়
- ৪. সর্বনাশ হয়

চ) কাদের সাথে কোন অবস্থাতেই বন্ধুত্ব রাখা যাবে না?
- ১. সহপাঠীদের সাথে
- ২. প্রতিবেশীর সাথে
- ৩. চরিত্রহীন লোকের সাথে
- ৪. আত্মীয়দের সাথে

২। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

ক) সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

খ) চরিত্রবান লোকের সাহচর্য নিলে নিজের চরিত্র ধ্বংস হয়।

গ) যার অন্তর আল্লাহর স্মরণ-শূণ্য তার আনুগত্য করতে হবে।

ঘ) অসৎ বন্ধু অপেক্ষা একাকিত্ব ভাল।

ঙ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করতে হবে।

চ) মানুষ অনুকরণপ্রিয়, তাই সে বন্ধুকে অনুকরণ করে।

৩। এক কথায় উত্তর দিন।

ক) সৎসঙ্গ অর্থ কি?

খ) সৎসঙ্গী বানানোর জন্য কয়টি গুণ দেখতে হবে?

গ) একাকিত্ব অপেক্ষা কি উত্তম?

ঘ) কার প্রভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের পথ প্রসারিত হয়?

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন।

ক) সৎসঙ্গ বলতে কী বুঝেছেন আলোচনা করুন।

খ) সৎসঙ্গ গ্রহণ করতে হবে কেন?

গ) সৎসঙ্গী নির্বাচনে কয়টি গুণের সমাবেশ থাকতে হবে গুণগুলো কী কী?

ঘ) অসৎ সঙ্গে কী কী ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

ঙ) সৎসঙ্গ ও অসৎ সঙ্গের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ৭

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আখলাক কাকে বলে? মানব জীবনে আখলাক-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

২. তাকওয়ার পরিচয় দিন, তাক্ওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

৩. সত্যবাদিতা কী? সত্যবাদিতার উপকারিতা লিখুন।

৪. আমানতের পরিচয় দিন। আমানত রক্ষা করার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৫. আহাদ এর পরিচয় দিন। ওয়াদা পালনের গুরুত্ব এবং ওয়াদা পালন না করার পরিণতি বর্ণনা করুন।

৬. সবর (ধৈর্য) এর পরিচয় দিন। সবর-এর প্রকারভেদ ও গুরুত্ব তৎপর্য লিখুন।

৭. আদল কাকে বলে? আদলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

৮. শালীনতার পরিচয় দিন। সমাজ-গঠনে শালীনতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

৯. আত্মশুদ্ধি বলতে কী বোঝায়? আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

১০. স্বদেশপ্রেম মানে কী? স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব এবং কিভাবে দেশের সেবা করা যায়?

১১. হালাল উপার্জন বলতে কী বুঝায়? হালাল উপার্জনের লক্ষ্য, গুরুত্ব ও উপকারিতা লিখুন।

১২. সৎসঙ্গ মানে কী? সৎ সঙ্গের গুরুত্ব লিখুন।